বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

ইসলামী উসূলে ফিকাহ

ইসলামী বিধান শাস্ত্রের উৎসগত পদ্ধতিবিদ্যা

তাহা জাবির আল-আলওয়ানী

ইসলামী উসূলে ফিকাহ

ইসলামী বিধান শাস্ত্রের উৎসগত পদ্ধতিবিদ্যা

মূল

ড. তাহা জাবির আল-আলওয়ানী

অনুবাদ

মুহাম্মদ নুরুল আমিন জাওহার

বাংলাদেশ ইন্‌স্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

ইসলামী উসূলে ফিকাহ
ইসলামী বিধান শাস্ত্রের উৎসগত পদ্ধতিবিদ্যা

মূল
ড. তাহা জাবির আল-আলওয়ানী

অনুবাদ
মুহাম্মদ নুরুল আমিন জাওহার

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
বাড়ী ২, সড়ক ৪, সেক্টর ৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
ফোন : ৮৯৫০২২৭, ৮৯২৪২৫৬, ০৬৬৬২৬৮৪৭৫৫, ০১৫৫৪৩৫৭০৬৬
Email: biit-org@yahoo.com

প্রথম প্রকাশ
১৯৯৬ খ্রিঃ

দ্বিতীয় প্রকাশ
২০০৩ খ্রিঃ

তৃতীয় প্রকাশঃ
২০০৯ খ্রিঃ

ISBN
984-8203-34-2

মূল্য
১০০.০০ টাকা মাত্র US $ 5.00

Islami Usule Fikah a bengali translated book from its english edition 'Usul Al Fiqh al Islami' written by Dr. Taha Jabir al Alwani, translated into bengali by Muhammad Nurul Amin Zaohar & Published (bengali edition) by Bangladesh Institute of Islamic Thought, House # 2, Road # 4, Uttara Model Town, Dhaka-1230, Bangladesh, Phone : 8950227, 8924256, 06662684755, 01554357066, Fax : 88-02-8950227.
Email: biit:-org@yahoo.com Price : TK. 100.00 only.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين

সকল প্রশংসা পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্ তাআলার
যিনি সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা এবং সালাত ও সালাম
তাঁর সর্বশেষ নবী ও রাসূলের (স:) প্রতি।

প্রকাশকের কথা

যে সকল মনীষী ইসলামী আইন শাস্ত্র (ফিকাহ্) ও ইসলামী আইনতত্ত্ব (উসূলে ফিকাহ্) অধ্যয়নে এবং এর গবেষণা ও উন্নয়নে যুগ যুগ ধরে অবদান রেখে এসেছেন তাঁদেরই একজন ড. তাহা জাবির আল আলওয়ানী বর্তমান সময়ের একজন বিশ্বসেরা ইসলামী পণ্ডিত। তার লেখা 'Usul Al Fiqh Al Islami' বইটির বাংলা সংস্করণ 'ইসলামী উসূলে ফিকাহ' নামে বিআইআইটি থেকে প্রকাশ করতে পেরে আনন্দবোধ করছি।

বস্তুত উসূলে ফিকাহ বা ইসলামী বিধানতত্ত্ব একটি অত্যন্ত কঠিন বিষয়। বাংলা ভাষায় এতে ব্যবহৃত পরিভাষার যথোপযোগী প্রতিশব্দ পাওয়া দুষ্কর। তবুও আমরা মূল পরিভাষার পাশাপাশি তার অর্থ প্রদানের চেষ্টা করেছি যাতে বাংলা ভাষায় এর একটি উপযুক্ত পরিভাষা গড়ে উঠতে পারে। বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত কোন নির্ভরযোগ্য উসূলে ফিকাহ্র অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি। কেবল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের জন্য তাদের পাঠ্যক্রমভুক্ত কিছু অংশের বাংলা অনুবাদ লক্ষ্য করা যায়।

আলোচ্য গ্রন্থখানি উসূলে ফিকাহ্র প্রাথমিক দিক। মূল গ্রন্থকার ছয় খণ্ডে সমাপ্ত একখানি উসূলে ফিকাহ্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। বর্তমান গ্রন্থখানি তারই অংশবিশেষ। এই গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেছেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালক জনাব মুহাম্মদ নুরুল আমিন জাওহার। অনুবাদ থেকে অনুবাদ তৈরি করলে বিষয় বিচ্যুতি ঘটার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে। তাই খ্যাতনামা গবেষক আলেম ও লেখক মাওলানা মুহাম্মদ মূসা মূল আরবির সাথে বাংলা অনুবাদ মিলিয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সম্পাদনা করে দিয়েছেন। এজন্য তাদের দু'জনকেই বিআইআইটির পক্ষ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ।

উল্লেখ্য, বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশ হয়েছিল ১৯৯৬ সালে, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ হয়েছিল ২০০৩ সালে এবং এটি এর তৃতীয় সংস্করণ। এর দ্বারা এমন একটি কঠিন বিষয়ের উপর লিখা বইয়ের পাঠক প্রিয়তা সহজেই অনুমান করা যায়।

আমাদের চারদিকের গভীরতম অন্ধকারে যারা আলোর সন্ধান করছেন, আমাদের সমসাময়িক সমস্যাসমূহ থেকে পরিত্রাণের উপায় বের করতে সচেষ্ট রয়েছেন-সেসব মুসলিম যুবকদের উদ্দেশ্যে আমরা এই গ্রন্থখানি নিবেদন করছি। আশা করি গ্রন্থখানি তাঁদের কাজে লাগবে ইন্শাআল্লাহ্।

এম আবদুল আজিজ
উপ- নির্বাহী পরিচালক

ভূমিকা

এই গবেষণাকর্মটি ১৯৭৩ সালে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী বিধান শাস্ত্রের উপর আমার পিএইচডি প্রোগ্রামের অংশ বিশেষ। পরবর্তীতে ১৯৮২ সালে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে ইসলামী চিন্তা/দর্শনের উপর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে 'জ্ঞানের ইসলামীকরণ' বিষয়ের উপর আমার থিসিসের এ অংশটুকু সংশোধিত আকারে উপস্থাপন করা হয়।

মুসলিম ইয়ুথলীগ যখন উসূল আল ফিকহ্ তথা ইসলামী বিধান শাস্ত্রের উৎসগত পদ্ধতি বিদ্যার উপর একটি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠানে আগ্রহ প্রকাশ করে, তখন আমার পূর্বে উপস্থাপিত এ অংশটুকু উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের ছয়টি বিষয়ের মধ্যে একটি অন্যতম বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। অতপর উক্ত কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই এই বক্তৃতাটি ছাপানো আকারে পেতে ইচ্ছে প্রকাশ করে।

যেহেতু 'জ্ঞানের ইসলামীকরণ' বিষয়ে অনুষ্ঠিত ইসলামাবাদ কনফারেন্সের জন্য একটি পেপার হিসেবে তা ছাপানো হয়েছিল এবং ইন্টারন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট ইসলামিক থ্যট তা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিল, সেহেতু আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, কনফারেন্সে উপস্থাপিত এ অংশটুকু যারা কোর্সে অংশ গ্রহণ করেছে এবং যারা প্রয়োজনীয় শরীয়াহ বিজ্ঞানের জ্ঞান আহরণ করতে চায় তাদের সামনেও উপস্থাপন করা যায় ।

মুসলিম চিন্তাবিদদের দ্বারা এপর্যন্ত উদ্ভাবিত গবেষণা পদ্ধতির মধ্যে উসূল আল ফিকহ্‌কেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান হিসেবে যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়। অবশ্য ইসলামী জ্ঞানের সকল শাখা সমূহের নির্খাদ ভিত্তি হিসেবে উসূল আল ফিকহ্ শুধুমাত্র ইসলামী সভ্যতার উপকার সাধনই করেনি বরং সামগ্রিকভাবে বিশ্ব সভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তিক মানোন্নয়নেও অবদান রেখেছে।

এটা বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবেনা যে, ইসলামী বিধান শাস্ত্রীয় কাঠামোতে যে সাদৃশ্যমূলক পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয় তাই পরীক্ষা মূলক মতবাদ প্রতিষ্ঠা ও গঠনে পদ্ধতিবিদ্যার প্রাথমিক বিন্দু হিসেবে কাঠামো দান করে- যা পরবর্তীতে সমসাময়িক সভ্যতার ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। আমরা এ বিষয়ে যারা জ্ঞান আহরনে আগ্রহী তাদের উদ্দেশ্যে এ সংক্ষিপ্ত গবেষণা কর্ম উপস্থাপন করছি।

আমরা মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করছি যাতে আমরা যা শিখছি তা থেকে উপকৃত হই এবং যাদ্বারা আমরা উপকৃত হই তা শিখতে পারি। যে জ্ঞান আমাদের উপকারে আসেনা তা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারি আর এমন কাজ থেকে বাঁচতে চাই যা আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় নয়। নিঃসন্দেহে বিশ্ব জগতের রক্ষাকর্তা, প্রভূ- আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা।

ড. তাহা জাবির আল আলওয়ানী

অনুবাদকের কথা

অর্থনীতির জগতে মুদ্রা যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিনিময় মাধ্যম, জ্ঞানের জগতেও অনুবাদ তেমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিনিময় মাধ্যম। তবে মূল উৎস থেকে আহরিত জ্ঞানের আনন্দ নি:সন্দেহে অণূদিত জ্ঞানের তুলনায় অনেক বেশি এবং অধিক নির্ভরযোগ্য। তারপরও মানব সভ্যতায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা কখনো ফুরাবে বলে মনে হয় না। অনুবাদের উপর সওয়ার হয়ে জ্ঞানের সফর চলতে থাকে ব্যক্তি মন থেকে সমাজ মনে, এক সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতিতে, যুগ থেকে যুগান্তরে। ড. তাহা জাবির আল-আলওয়ানী রচিত গবেষণা গ্রন্থ 'উসূল আল ফিকাহ আল-ইসলামী' তেমনি এক যুগান্তরের সফর। ইসলামী চিন্তাধারার চরম উৎকর্ষের যুগে অনুসৃত গুরুত্বপূর্ণ এই গবেষণা পদ্ধতির সাথে আধুনিক গবেষকদেরকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার মহৎ উদ্দেশ্যে লেখক আরবি ভাষায় গ্রন্থখানি রচনা করেছিলেন। অত:পর ইউসুফ তালাল দেলোরেনযো এবং এ. এস. আল-শাইখ আলী কর্তৃক এই মূল্যবান গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ একইভাবে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে। 'আমাদের' বলছি এ কারণে যে, মূলত: বাংলাদেশ ইন্‌স্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে অধ্যাপক জয়নুল আবেদীন মজুমদারের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা না পেলে আমিও হয়তো এ গ্রন্থখানি অনুবাদের কাজ হাতে নিতাম না। এজন্য আমি তাঁদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। অনুবাদ করতে যে সকল অসুবিধার কথা ইংরেজি অনুবাদক উল্লেখ করেছেন, তাঁর অনুভূতির সাথে আমার অনুভূতির কোন ব্যতিক্রম নেই। বরং ক্ষেত্রবিশেষে বঙ্গানুবাদের সমস্যা তুলনামূলকভাবে বেশিই বলা যায়। কারণ বর্তমানে ইংরেজি ভাষায় স্বল্প পরিমাণে হলেও ইসলামী আইন সম্পর্কিত গ্রন্থাদি পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে বিশেষত: ফিকাহ শাস্ত্র সম্পর্কিত গ্রন্থ নেই বললেই চলে। ফলে অনুবাদকের কাছে সর্বপ্রথম যে সমস্যাটি প্রকট হয়ে দেখা দেয় তা হলো পরিভাষাসমূহের অনুবাদ করার সমস্যা। আশা করি সুধী পাঠকগণের সুচিন্তিত পরামর্শ গ্রন্থটির আগামী সংস্করণকে আরো সমৃদ্ধ করবে। পাণ্ডুলিপি কপি করার কাজে আমার স্ত্রী বেগম আলিমা আফরোজা আমাকে সহায়তা করেছেন, এজন্যে তাঁকে দোয়া করি।

সকল কৃতজ্ঞতা একমাত্র মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে।

মুহাম্মদ নুরুল আমিন জাওহার

সূচি

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

উসূলে ফিকহ্ : ইসলামী বিধান শাস্ত্রে গবেষণা ও জ্ঞানের পদ্ধতিবিদ্যা

উসূলে ফিকাহ্-এর সংজ্ঞা

'উসূল' শব্দটি 'আস্ল'-এর বহুবচন। শাব্দিক অর্থ 'মূল' বা 'ভিত্তি' অর্থাৎ যে বস্তুর উপর অন্য বস্তুর ভিত্তি স্থাপন করা হয় তাকে বলে 'আস্ল'। 'ফিকাহ্' শব্দের অর্থ জ্ঞান, ব্যুৎপত্তি; পারিভাষিক অর্থ ইসলামী শরীআত সম্পর্কিত জ্ঞান, গবেষণার সাহায্যে ইসলামী শরীআতের বিধানসমূহ তার উৎস থেকে নির্গত করার শাস্ত্র, এক কথায় 'ইসলামী আইনের সমষ্টি'। অতএব উসূলে ফিকাহ্ অর্থ 'আইন শাস্ত্রের ভিত্তি', 'আইনের মূলনীতি', 'আইনতত্ত্ব'।

মুহিব্বুল্লাহ ইব্ন আবদুশ শাকুর বিহারী (মৃ. ১১১৯ হি./১৭০৭ খৃ.) উসূলে ফিকাহ-এর নিম্নোক্ত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন : "যে নীতিমালার জ্ঞান ফিকাহ শাস্ত্রের আইনসমূহ দলীল-প্রমাণ দ্বারা উদঘাটন করতে সাহায্য করে তাকে উসূলে ফিকাহ্ বলে"।

বাদরান আবুল আয়নায়ন তাঁর উসূলুল ফিকাহ্ গ্রন্থে নিম্নোক্ত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন: "উসূলে ফিকাহ্ এইরূপ কতগুলো মূলনীতি এবং প্রতিপাদ্যের সমষ্টি যেগুলোর সাহায্যে বিস্তারিত দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে শরীআতের ব্যবহারিক বিধান নির্গত (ইসতিম্বাত) করা হয়।"

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী তাঁর আল-মাহ্সূল ফী ইলমি উসূলিল ফিকাহ্ গ্রন্থে বলেন, "যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে সামগ্রিকভাবে ফিকাহ্ শাস্ত্রের সকল শাখা সম্পর্কে এবং তার অনুকূলে প্রদত্ত দলীল-প্রমাণ, তার অবস্থা ও তা প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায় তাকে উসূলে ফিকাহ্ বলে।"[১]

---

১. দেখুন ফখরুদ্দীন আল-রাযী প্রণীত আল-মাহ্সূল ফী ইলমি উসূলিল ফিকাহ্, ড. তাহা জাবির আল-আলওয়ানী, রিয়াদ, ইমাম ইবনে সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্পাদিত, ১ম সংস্করণ ১৩৯৯/১৯৭৯, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৪।

বিষয়বস্তু

শরীয়াহর মূল উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত দলীল-প্রমাণসমূহ এবং কিভাবে ঐ সকল দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে ইজতিহাদের মাধ্যমে আইন বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে কিংবা দলীল-প্রমাণ বর্ণনায় পরস্পর বিরোধী বক্তব্য থাকা সত্ত্বেও কিভাবে অগ্রাধিকার নির্বাচন করা হয়েছে সে সকল বিষয় অধ্যয়নই উসূলে ফিকাহ্‌র বিষয়বস্তু।[২]

উসূলে ফিকাহ্‌র উপকারিতা

যাঁরা ইজতিহাদ করার যোগ্যতা রাখেন এবং যারা আইনদাতা (আল্লাহ তায়ালা) কর্তৃক নাযিলকৃত দলীল-প্রমাণ অনুসারে ইজতিহাদ করার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ করতে পারেন, তাঁরা উসূলে ফিকাহ শাস্ত্র অধ্যায়ন করে শরীয়াহ সম্পর্কিত রায় বা সিদ্ধান্ত প্রদানে সক্ষম হবেন। যাঁরা ইজতিহাদ করতে সক্ষম নন তাঁরাও উসূলে ফিকাহ্ অধ্যয়ন করে উপকৃত হতে পারেন। মুজতাহিদগণ (যাঁরা ইজতিহাদ করেছেন) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মাযহাব তথা আইন সম্বন্ধীয় মৌলিক চিন্তাধারাসমূহ এবং যে সকল যুক্তির ভিত্তিতে মুজতাহিদগণ তাঁদের রায় প্রদান করেছেন সেগুলো অধ্যয়ন করে ইসলামী আইনতত্ত্বের একজন ছাত্র বিভিন্ন মৌলিক চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হতে পারেন। তিনি এগুলো বিশ্লেষণ করে এবং প্রয়োজনে মুজতাহিদগণ প্রদত্ত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্য থেকে যে কোনটি বেছে নিতে বা অগ্রাধিকার নির্বাচন করতে পারবেন। উপরন্তু তারা সর্বজন শ্রদ্ধেয় মুজতাহিদগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে আইন সম্পর্কীয় নিজস্ব যুক্তিও খাড়া করতে পারবেন।

যে সকল জ্ঞান থেকে উসূলে ফিকাহ্ তাত্ত্বিক ভিত্তি লাভ করেছে

মূলত: "উসূলে ফিকাহ্" জ্ঞানের একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র শাখা। অবশ্য এই জ্ঞান স্বত:সিদ্ধ হিসেবে বিবেচ্য কতগুলো মৌলকথার (মুকাদ্দিমাহ্) উপর প্রতিষ্ঠিত, যার জ্ঞান ছাড়া ইসলামী আইনবিদগণ এক পা'ও অগ্রসর হতে পারেন না। এ মৌলকথাগুলো এসেছে জ্ঞানের বিভিন্ন উৎস থেকে। যেমন :

২.আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, শরীয়াহ ফ্যাকাল্টির অধ্যাপকবৃন্দ কর্তৃক উসূলে ফিকাহ বিষয়ে প্রণীত টিকাসমূহ দেখুন, শিক্ষাবর্ষ ১৩৮২/১৯৬৩, পৃ: ২২।

(ক) কিছু কিছু মৌলকথা এসেছে এ্যারিস্টটলীয় তর্কশাস্ত্র থেকে, যা সাধারণত ধর্ম-দর্শনের লেখকগণ (মুতাকাল্লিমূন) তাঁদের লেখার ভূমিকা হিসেবে বর্ণনা করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁরা তাঁদের এ সকল তাত্ত্বিক আলোচনার শব্দার্থ থেকে তাৎপর্য বিশ্লেষণ করার নিয়মাবলী, ভূত ও ভবিষ্যতের ভিত্তিতে বিষয় বিন্যাস, বিষয়ের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার ভিত্তিতে প্রত্যয়মূলক নীতিমালা প্রণয়ন এবং সে অনুসারে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা ও প্রকরণ নিরূপণ, আরোহ পদ্ধতিতে যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে উপসংহারের বৈধতা দাবি ও যুক্তি-প্রমাণসমূহ উপস্থাপন করতেন এবং কিভাবে এগুলোকে যুক্তিদাতার দাবির সমর্থনে ব্যবহার করা হয়েছে, অথবা বিরোধী যুক্তিসমূহ খণ্ডন করা হয়েছে ইত্যাদি উল্লেখ করতেন।

(খ) কিছু কিছু মৌলকথা এসেছে "ইলমুল কালাম" বা ধর্মতত্ত্বের সূক্ষ্ম আলোচনা থেকে। তাঁরা তাঁদের আলোচনায় সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হাকিমের (আল্লাহ তায়ালা) বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত প্রশ্নের অবতারণা করেন। এভাবে সত্য এবং মিথ্যা কিভাবে নিরূপিত হবে, শরীয়াহ যুক্তি নির্ভর কি না, ওহীর জ্ঞান ব্যতিরেকে কেউ সত্য বা মিথ্যা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারেন কি না, বা সর্বপ্রকার নিয়ামতদাতা সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা কর্তব্য কি না একথা আমরা কি শরীয়াহ থেকে জেনেছি না মানবীয় বুদ্ধি থেকে জেনেছি।

(গ) উসূলের আলিমগণ ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে কতগুলো সাধারণ ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মের বিকাশ ঘটান এবং এগুলোর পরিশীলিত রূপ দান করেন তাঁরা বিভিন্ন ভাষা ও ভাষার উৎপত্তি, ভাষায় ব্যবহৃত অলংকার ও আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত শব্দের শ্রেণীবিভাগ, শব্দের ব্যুৎপত্তি, প্রতিশব্দ, অনুপ্রাস, সাধারণ অর্থে ও বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত শব্দ সম্পর্কে আলোচনা এবং বিভিন্ন অনুসর্গের বৈয়াকরণিক তাৎপর্য সম্পর্কিত গবেষণা করেন।

(ঘ) কিছু কিছু মৌলকথা গৃহীত হয়েছে কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কিত মৌলিক গ্রন্থাবলী থেকে। এ সকল গ্রন্থে একজন মাত্র বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত হাদীস (আহাদ) অথবা বহুসংখ্যক নিখুঁত বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত হাদীস (তাওয়াতুর), কুরআনের বিশুদ্ধ তিলাওয়াত এবং তিলাওয়াতের নিয়মাবলী, হাদীসের বর্ণনাকারীগণের গ্রহণযোগ্যতা (তা'দীল) অথবা অগ্রহণযোগ্যতা (জারহ), কুরআনের কোন আয়াত বা হাদীস রহিত হওয়া সম্বলিত নীতিমালা (আন-নাসিখ

ওয়াল-মানসূখ),[৩] হাদীসের বিষয়বস্তু এবং বর্ণনাকারীগণের ধারাবাহিকতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

(৬) সবশেষে, উসূলবিদগণ কর্তৃক কোন বিশেষ ফিকাহ্ সম্পর্কে পেশকৃত যুক্তির সমর্থনে প্রদত্ত ব্যাখ্যাসমূহ এবং একই বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বিস্ত ারিতভাবে গৃহীত দলিল-প্রমাণকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

উসূলবিদগণ নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহকে প্রাথমিকভাবে তাঁদের বিবেচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেন :

❖ যুক্তি এবং স্বতঃসিদ্ধসমূহ।

❖ ভাষাতত্ত্ব।

❖ আদেশ ও নিষেধাবলী।

❖ সাধারণ (আল-আম) এবং বিশেষ বিষয়ে (আল-খাস্)।

❖ দ্ব্যর্থক (আল-মুজমাল) এবং সুস্পষ্ট (মুবায়্যিন) প্রত্যয়সমূহ।

❖ রহিতকরণ (আন-নুস্খ)।

❖ কর্ম বা আমল, বিশেষত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলসমূহ এবং তাঁর গুরুত্ব।

❖ ইজমা (সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত)।

❖ সুন্নাহ (আল-আখবার)।

❖ কিয়াস (সাদৃশ্যমূলক যুক্তিবাদ)।

❖ মতদ্বৈততা ও অগ্রাধিকার (তাআরুদ ওয়া তারজীহ)।

❖ ইজতিহাদ।

❖ তাকলীদ (শরীয়াহ সম্পর্কে কোন বিশেষ চিন্তাধারার অনুসরণ)।

❖ বিতর্কিত দলীল-প্রমাণ (চারটি স্বীকৃত উৎস বহির্ভূত)।

উসূলে ফিকাহ্-এর উৎপত্তি ও বিকাশ

যে বিশাল দলীল-প্রমাণের ভাণ্ডারকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে ইসলামী শরীয়াহর বাস্তব বিধি-বিধান প্রণীত হয়েছে সেই ভাণ্ডার অর্থাৎ ফিকাহ শাস্ত্রের

৩.আন-নাসিখ আল-মানসূখ : কুরআনের কোন আয়াতের বিধান বা হাদীস অন্য কোন আয়াত বা একটি হাদীস অন্য একটি হাদীস দ্বারা রহিত করলে উক্ত আয়াত বা হাদীসকে 'নাসিখ' এবং রহিতকৃত আয়াত বা হাদীসকে 'মানসূখ' বলা হয়। উসূলের এই শাখা কুরআন বা হাদীসের কোন বিধান অন্য কোন হাদীস বা কুরআনের আয়াত দ্বারা রহিত করা হয়েছে কি না, সে বিষয়ে অধ্যয়ন করে।

ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন না করে উসূলে ফিকাহ্-এর উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে অধ্যয়ন করা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

শাব্দিক অর্থে উসূল হলো ভিত্তি বা মূল (আসল), বহুবচনে উসূল, যার উপর ভিত্তি করে কোন কিছু নির্মাণ করা হয়। ইসলামী আইন ব্যবস্থায় ফিকাহ্ শাস্ত্র যে ভিত্তিমূলের (উসূল) উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলো নিয়েই গঠিত উসূলে ফিকাহ্ যাকে বাংলাভাষায় "ইসলামী আইনতত্ত্ব" বলা যায়। সুতরাং উসূলে ফিকাহের উৎপত্তি সম্পর্কে ধারণা পেতে হলে আমাদেরকে ইসলামী শরীয়াহর (তাশরী) ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হবে।

শরীয়াহর আইন প্রণয়ন করা, উক্ত আইনের সুপারিশ করা, বিধি-বিধান ঘোষণা করা ইত্যাদি সবই একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাজ। কেউ যদি এ সকল কাজের এখতিয়ার আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো উপর আরোপ করে, তবে তা শিরক হিসেবে গণ্য হবে এবং কার্যত তা আল্লাহর একত্বের (তাওহীদ) ধারণার সাথে বিরোধিতা করার শামিল।

আল্লাহ্ তায়ালা ঈমানদারগণের সামনে এমন বহু সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং বাস্তব নজীর পেশ করেছেন যাতে আল্লাহর নির্দেশাবলীর (আহকাম) উপকরণ পেতে কোন অসুবিধা না হয়। ইসলামী উম্মাহ এরূপ কিছু কিছু দলীল-প্রমাণের বৈধতা এবং আল্লাহর নির্দেশাবলীর সাথে এগুলোর সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌছেছেন তাঁরা সর্বসম্মতভাবে এগুলোকে গ্রহণও করেছেন। আবার কিছু কিছু দলীল-প্রমাণের ও তথ্য সূত্রের ব্যাপারে উম্মাহর মধ্যে রয়েছে মতভেদ।

দু'টি দলীলের ব্যাপারে সমগ্র উম্মাহ্ ঐকমত্য পোষণ করেন, তাদের বৈধতা সম্পর্কেও রয়েছে সর্বজনগ্রাহ্যতা। রাসূলুল্লাহর (সাঃ)-এর সময়ে এ দু'টি উৎস থেকে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। আইনের সে দু'টি উৎস হচ্ছে :

(১) কুরআন : যে সকল শব্দ বা বাণী রাসূল (সাঃ)-এর নিকট ওহী হিসেবে নাযিল হয়েছিল, যা তেলাওয়াত করা ইবাদত হিসেবে গণ্য, মানবজাতির কাছে যার সংক্ষিপ্ততম সূরার অনুরূপ সূরা রচনা করার জন্য চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করা হয়েছিল, যার প্রতিটি বর্ণ আমাদের কাছে সন্দেহাতীত ও নির্ভুল ধারাবাহিকতার মাধ্যমে (তাওয়াতুর) এসেছে, যা আমাদের নিকট এসেছে পবিত্র গ্রন্থ হিসেবে (মুস্হাফ), যার শুরু হয়েছে সূরা ফাতিহা (ভূমিকা) দিয়ে এবং যার শেষ হয়েছে সূরা 'নাস' দিয়ে।

(২) সুন্নাহ : কুরআন ব্যতিরেকে রাসূল (সাঃ) যা বলেছেন, করেছেন এবং সমর্থন করেছেন তার সবই সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং নবুয়াতের শুরু থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রাসূল (সাঃ)-এর সকল কাজই হচ্ছে সুন্নাহ। সাধারণ অর্থে উম্মাহর সকল সদস্যের উপর প্রযোজ্য অথবা রাসূল (সাঃ)-এর নিজের উপর প্রযোজ্য ইত্যাদি সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

রাসূল (সাঃ) স্বভাবগতভাবে করেছেন এমন কোন কাজ বা অন্য যে কোন প্রকার কাজ, তাঁর সব কথা এবং সমর্থন ইত্যাদি সকল কিছুই আইন সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। হতে পারে তাঁর কোন কথা বা কাজ বা আচরণ একই সাথে আদেশ, সুপারিশ, নিষিদ্ধকরণ, অননুমোদন কিংবা অনুমোদন হিসেবে গণ্য। এ রূপও হতে পারে যে, তাঁর কোন কথা বা কাজ কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বের কোন বিধানের উপর ভিত্তি করে বলা বা করা হয়েছে, কিংবা তা নিজেই পৃথক একটি আইনের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। রাসূল (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় শরীয়াহর সকল প্রকার বিধান (আহ্কাম), যেমন– মৌলিক কোন সিদ্ধান্ত, পর্যালোচনার ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত, মৌল আকীদাসমূহ এবং ব্যক্তিগত জীবনে অনুসরণীয় যাবতীয় বিধি-বিধান উক্ত দু'টি উৎস যথাক্রমে কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

(৩) ইজতিহাদ : রাসূল (সাঃ) নিজে এবং শরীয়াহ সম্পর্কে অভিজ্ঞ সাহাবীগণ (আহলুন নাযার) ইজতিহাদ করেছেন। রাসূল (সাঃ)-এর ইজতিহাদ কখনো কুরআনের আয়াত দ্বারা সমর্থিত হয়েছে আবার কখনো কখনো আল্লাহ তায়ালা আরো ভাল কোন সিদ্ধান্ত দ্বারা রাসূল (সাঃ) কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাকে বাতিল করেছেন। সাহাবীগণ সাধারণত এরূপ পরিস্থিতিতেই ইজতিহাদ করেছেন, যখন কোন ঘটনা তাঁদের নিজেদের জীবনেই সংঘটিত হয়েছে। এরপর তাঁরা রাসূল (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন এবং ঐ পরিস্থিতিতে তাঁরা কিরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাও তাঁকে বলেছেন। রাসূল (সাঃ) কোন কোন সময় সাহাবীগণের ইজতিহাদকে অনুমোদন করেছেন, তাঁদের এরূপ সিদ্ধান্ত পরে সুন্নাহর অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়। আবার রাসূল (সাঃ) সাহাবাগণের কোন ইজতিহাদকে অনুমোদন দান না করে সঠিক কার্যক্রম সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তাও পরবর্তী পর্যায়ে সুন্নাহরূপে পরিগণিত হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সেই পর্যায়ে শরীয়াহ সাধারণত দুই ধরনের প্রত্যাদেশের (ওহী) ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে :

(১) তিলাওয়াতকৃত বা নাযিলকৃত প্রত্যাদেশ (ওহী মাতলু) অর্থাৎ অনুপম শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী (ইজায) পবিত্র কুরআন এবং

(২) তিলাওয়াত বহির্ভূত প্রত্যাদেশ (ওহী গায়র মাতলু) অর্থাৎ রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহ।

বস্তুত রাসূল (সাঃ) কর্তৃক সম্পাদিত ইজতিহাদ সাহাবীগণ এবং তৎপরবর্তী যুগের মুসলমানদের জন্য অনুসরণীয় নজির স্থাপন করেছে এবং ইজতিহাদের বৈধতা প্রদান করেছে। যাতে কোন বিষয়ে কুরআন এবং সুন্নাতে সুস্পষ্ট আইনগত সিদ্ধান্ত পাওয়া না গেলে তাঁরা নিজেরাই ইজতিহাদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

এছাড়া সম্ভবত এ ধারাকে আরো শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে রাসূল (সাঃ) তাঁর উপস্থিতিতে কয়েকজন সাহাবীকে কোন কোন বিষয়ে ইজতিহাদ করার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। এরপর তিনি কে ভুল করেছেন এবং কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, তা বলে দিয়েছেন।

এসব উৎসের ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের পন্থা

কুরআনের আলোকে ব্যাকরণের সাহায্য ছাড়াই সাহাবীগণ সরাসরি কুরআন শিখেছেন এবং বুঝেছেন। অনুরূপভাবে তাঁরা তাঁদের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে আইনদাতা আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য এবং এর অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা খুব সহজেই উপলব্ধি করেছেন।

বস্তুত রাসূল (সাঃ) প্রথমত: নিজে কোন বিষয়ে ইঙ্গিত না করলে সাহাবীগণ কদাচিত কোন বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আমি রাসূল (সাঃ)-এর সাহাবীগণের চাইতে উত্তম মানুষ আর কখনো দেখিনি। আল্লাহ তাঁদেরকে কল্যাণ এবং শান্তি দান করুন। তিনি এ দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়া পর্যন্ত তাঁর সমগ্র জীবনে সাহাবাগণ তাঁকে মাত্র তেরটি বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন যার সবগুলো সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ : "তারা তোমাকে

পবিত্র মাসে জিহাদ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে..." (২ : ২২)। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "তারা শুধুমাত্র তাদের সাথে বাস্তবিকপক্ষে যে সকল বিষয় প্রাসঙ্গিক কেবল সে সকল বিষয়ে প্রশ্ন করেন।"[৪]

এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, যে ঘটনা ঘটেনি সে বিষয়ে প্রশ্ন করো না। কারণ আমি আমার পিতা উমর ইবনুল খাত্তাবকে বলতে শুনেছি, অভিশাপ তাদের উপর, যা ঘটেনি এমন বিষয়ে প্রশ্ন করে।[৫]

কাসিম (রাঃ) বলেন, "তোমরা এমন সব বিষয়ে প্রশ্ন কর যা আমরা কখনো করিনি, এমন বিষয়ে বিতর্ক কর যা নিয়ে আমরা কখনো বিতর্ক করিনি। তোমরা এমনকি এমন সব বিষয়ে প্রশ্ন কর, যেগুলোর সাথে আমি আদৌ পরিচিত নই। তবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার পর আমরা নীরব থাকার অনুমতিও পেতাম না।"[৬]

হযরত ইবনে ইসহাক বলেন, "আমি অন্য যে কারো অপেক্ষা রাসূল (সাঃ)-এর অধিক সংখ্যক সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছি। কিন্তু সহজ-সরল জীবনযাপনকারী হিসেবে এবং নিজেদের ব্যাপারে সবচাইতে কম চাওয়া-পাওয়ার দাবিদার হিসেবে তাঁদের মতো আর কাউকে দেখিনি।"[৭]

হযরত উবাদাহ ইবনে নুসাই আল-কিন্দী বলেন, "আমি যে সকল লোকের কথা জানি, যাদের কৃচ্ছ্রতা তোমাদের মতো এতো কঠোর ছিল না, যাঁদের প্রশ্নগুলো ছিল তোমাদের চাইতে স্বচ্ছ।"[৮]

আবু উবায়দা তাঁর মাজযুল-কুরআন গ্রন্থে বলেছেন, আমি এমন কথা কখনো শুনিনি যে, পবিত্র কুরআনে কোন বিষয়ে স্পষ্টভাবে বর্ণিত থাকার পরও সাহাবীগণ সে বিষয়ে রাসূল (সাঃ)-এর নিকট জানতে চেয়েছেন।"[৯]

---

৪. দেখুন আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুর রহমান আদ-দারিমী, সুনান, ১খ, ৫১।
৫. আদ-দারিমী, পূর্বোক্ত, ১খ, ৫০।

৬. আদ-দারিমী, ১খ, ৪৯।
৭. পূর্বোক্ত, ১খ, ৫১।
৮. পূর্বোক্ত বরাত।
৯ শেখ আলী আবদুর রাজ্জাক কর্তৃক প্রণীত তামহীদ লি-তা'রীখিল ফালাসিফা থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ১৫২।

রাসূল (সাঃ)-এর কথাগুলো সুন্নাহ হিসেবে পরিগণিত সেগুলো সাহাবীগণের মাতৃভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। ফলে তাঁরা এগুলোর অর্থ বুঝতেন এবং বক্তব্য ও বিষয়বস্তু সহজে অনুধাবন করতে পারতেন।

রাসুল (সাঃ)-এর যে সকল কাজ সুন্নাহ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে তার সবগুলোই সাহাবীগণের সাক্ষাতে সংঘটিত হয়েছে। এরপর তাঁরা সেগুলো হুবহু অন্যদের নিকট বর্ণনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, রাসূল (সাঃ) শত শত সাহাবীর উপস্থিতিতে উযু করেছেন, এরপর সাহাবীগণ কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ না করেই তা অনুসরণ করেছেন। অনুরূপভাবে উযুর মতো রাসূল (সাঃ)-এর আরো অনেক কাজ ছিল যেগুলোর কোনটি ফরজ, কোনটি উপদেশ, আবার কোনটি নিছক অনুমতি কিংবা কোনটির বেলায় তাঁর অনুমতি পাওয়া যায়নি। তেমনিভাবে তাঁরা দেখেছেন রাসূল (সাঃ) কিভাবে সালাত, হজ্জ ও অন্যান্য ইবাদতসমূহ আদায় করেছেন।

সাহাবীগণ দেখেছেন যে, লোকেরা রাসূল (সাঃ)-এর নিকট কোন বিষয়ে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করছেন এবং তিনি তা বলে দিচ্ছেন, তাঁর নিকট বিচার প্রার্থনা করা হয়েছে এবং তিনি রায় প্রদান করেছেন। সাহাবীগণের নিজেদের মধ্যে কোন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে; তিনি সে বিষয়ে সুস্পষ্ট জবাব দিয়েছেন। এ সকল সমস্যার কোনটি হয়তো ছিল তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত আচরণ কিংবা বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়ে। এ সকল পরিস্থিতিতে তাঁরা সকলেই ছিলেন একেকজন সাক্ষী। তাঁরা বুঝতেন বিষয়ের বা ঘটনার প্রেক্ষাপট। ফলে রাসূল (সাঃ) প্রদত্ত রায়ের বিচক্ষণতা বা এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ইত্যাদি কোন কিছুই তাঁদের অজ্ঞাত ছিল না।

লোকেরা দেখেছে, কিভাবে রাসূল (সাঃ) তাঁর সাহাবী ও অন্যান্যদের আচরণ অবলোকন করেছেন। সুতরাং রাসূল (সাঃ) যখন কারো প্রশংসা করতেন তখন সাহাবীগণ বুঝতেন যে, ঐ ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কাজটি ছিল ভাল। যদি তিনি কারো সমালোচনা করতেন তখন তাঁরা বুঝতেন যে, লোকটি যে কাজ করেছে তাতে কোন ভুল ছিল।

উপরন্তু রাসূল (সাঃ) কর্তৃক বিভিন্ন বিষয়ে প্রদত্ত যাবতীয় ফতোয়া, রায় বা সিদ্ধান্ত, অনুমোদন বা অননুমোদন সম্পর্কে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে বুঝা যায় যে, অধিকাংশ ঘটনা বহুসংখ্যক লোকের সামনে সংঘটিত হয়েছে।

একজন ডাক্তারের সহকর্মী যেমন দীর্ঘদিন ডাক্তারের সাথে থেকে অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝতে পারে যে, কেন রোগীকে বিশেষ ঔষধটি দেয়া হয়েছে,[১০] তেমনি সাহাবীগণও রাসূল (সাঃ) কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের পিছনে যে যুক্তিগুলো রয়েছে তা সঠিকভাবেই বুঝতেন।

ইজতিহাদের বৈধতা ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে সমসাময়িক বেশ কিছু ঘটনা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন– হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে ইয়েমেন-এ প্রেরণকালে রাসূল (সাঃ) তাঁকে বলেছিলেন।

"তোমার নিকট কোন বিষয়ে যদি ফায়সালা চাওয়া হয় তখন তুমি কি করবে? মুয়ায বললেন, "আমি আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফায়সালা করবো।" রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, যদি সে বিষয়ে আল্লাহর কিতাবে কোন সমাধান না পাও? মুয়ায বললেন, "তখন আমি রাসূলের (সাঃ) সুন্নাহ অনুসারে ফায়সালা করবো।" রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, যদি তুমি সুন্নাহতে তা না পাও তাহলে কি করবে? মুয়ায বললেন, "তখন আমি ইজতিহাদের মাধ্যমে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব।" রাসূল (সাঃ) হযরত মুয়াযের বুকে চাপড় দিয়ে বললেন, "আল্লাহর শুকরিয়া যে, তিনি তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিকে এমন পথের সন্ধান দিয়েছেন যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মনঃপুত।"[১১]

হযরত মুয়ায (রাঃ) কর্তৃক ইজতিহাদ এবং তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, অনুরূপভাবে হযরত উমর (রাঃ) কর্তৃক হযরত আবু মূসাকে বিচারক নিয়োগ করে প্রদত্ত উপদেশাবলী থেকে এ বিষয়ের ধারণাটি আরো বিস্তৃতি হয়েছে :

"কুরআনের নির্দেশের ভিত্তিতে অথবা সুন্নাহর কোন প্রতিষ্ঠিত আমলের উপর ভিত্তি করে রায় প্রদান করবে...।" এরপর তিনি আরো বলেছিলেন, "তোমার কাছে আনীত বিচারগুলোর প্রতিটি সম্পর্কে তুমি যদি নিশ্চিত হও যে, কুরআন বা সুন্নাহর কোন নির্দেশে এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তাহলে তোমার কাজ হবে কুরআন বা সুন্নাহর নির্দেশের তুলনা বা সাদৃশ্য (কিয়াস) অনুসন্ধান করা। রায় প্রদানের

---

১০. শাহ ওয়ালিউল্লাহ দিহলাবী, হুজ্জাতুল্লাহিল বাগিলা (মিসর), ১খ, ২৮৯।

১১. উদাহরণ হিসেবে এই হাদীস পেশের বৈধতা সম্পর্কে দেখুন, লেখকের আল ইজতিহাদ ওয়াত-তাকলীদ (কায়রো, দারুল আনসার), ২৩-২৪ঃ এবং আল-মাহসূল গ্রন্থের ইজতিহাদ সম্পর্কিত অধ্যায়সমূহ।

জন্য এরূপ সাদৃশ্য অনুসন্ধান করা ন্যায়ের খুব কাছাকাছি এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে সর্বোত্তম হবে আশা করা যায়।"[১২]

এ প্রেক্ষিতে ইমাম শফিঈর মতে এক অর্থে ইজতিহাদ হলো 'অভিমত' অপর অর্থে ইজতিহাদ হলো 'কিয়াস'। তিনি মনে করেন যে, এগুলো হলো একই বিষয়ের দুটি নাম।[১৩]

খলিফাতুর রাসূল (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেছেন, "রাসূলের (সাঃ) সকল অভিমতই নির্ভুল। কেননা আল্লাহ সব সময় তাঁকে পরিচালিত করেছেন। কিন্তু আমাদের বেলায় আমরা মতামত প্রদান করি এবং আন্দাজ অনুমান করি।"[১৪]

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, ঐ পর্যায়ে ইজতিহাদ বা 'অভিমত' সম্পর্কিত ধারণা নিম্নবর্ণিত বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল :

(ক) কোন আদেশের যদি দুই বা ততোধিক ব্যাখ্যা করার অবকাশ থাকে তবে সে ক্ষেত্রে এক বা একাধিক সম্ভাব্য অর্থ প্রয়োগ করা। যেমন–রাসূল (সাঃ) একদল মুসলমানকে বনু কোরায়জার এলাকায় পৌঁছে আসরের সালাত আদায় করার আদেশ প্রদান করেছিলেন।[১৫]

(খ) তুলনামূলক অনুমান (কিয়াস) : কোন ঘটনা বা বিষয়কে কুরআন বা সুন্নাহর সাথে তুলনা করা। যেমন হযরত আমরের কিয়াসের ঘটনা, যিনি সঙ্গমজনিত নাপাকির দরুন গোসলের সাথে তায়াম্মুমকে (পবিত্রতা অর্জনের জন্য পাক মাটি

---

১২. দেখুন ইবনে কাইয়্যিম প্রণীত ইলামূল-মুয়াক্কীঈন (গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে)।

১৩. দেখুন ইমাম শাফিঈ প্রণীত আর-রিসালাহ, কায়রো, পৃঃ ৪৭৬।

১৪. ইবনে কাইয়্যিম, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, ১খ, ৫৪; এবং ইবনে আবদুল বার, জামি বায়ানিল ইলম, ২য় খণ্ড, ১৩৪।

১৫. রাসূল (সাঃ) একবার একদল মুসলমানকে নিম্নোক্ত নির্দেশসহ প্রেরণ করলেন ঃ "বনু কোরায়জায় পৌঁছে সালাত আদায় করবে।" তাঁর এই আদেশকে শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করে দলের কিছু সংখ্যক লোক নির্ধারিত সময়ে আসর সালাতের জন্য না থেমে প্রায় সূর্যাস্ত পর্যন্ত সফর অব্যাহত রাখেন এবং বনু কোরায়জায় গিয়ে আসরের সালাত আদায় করেন। আবার কিছু সংখ্যক লোক যারা রাসূলের (সাঃ) আদেশের শাব্দিক অর্থ গ্রহণ না করে এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুসরণ করতে গিয়ে বনু কোরায়জায় পৌঁছার পূর্বে খুবই স্বল্প সময়ের জন্য যাত্রা বিরতি করে আসরের সালাত আদায় করেন। রাসূল (সাঃ)-এর নিকট উভয় দলের ঘটনা বর্ণনা করা হলে তিনি বলেছিলেন, উভয়ই সঠিক।"

বা ধুলির সাহায্যে মুখমণ্ডল ও দু'হাত মালিশ করা) তুলনা করে তাঁর সারা শরীর ধুলি দ্বারা মুছে নিয়েছিল।[১৬]

(গ) ইজতিহাদের মাধ্যমে কোন কিছুর সম্ভাব্য কল্যাণকর দিকসমূহ তুলে ধরা, সম্ভাব্য ভুল থেকে বেঁচে থাকার জন্য কোন কিছুকে নিষিদ্ধ করা অথবা কোন সাধারণ বিবরণ থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বা কোন সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করা ইত্যাদি।

রাসূল (সাঃ) সাহাবীগণকে ইজতিহাদের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছিলেন এবং ইজতিহাদের জ্ঞানকে প্রয়োগ করার ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দান করেছিলেন, তার প্রমাণ নিম্নোক্ত হাদীস থেকে পাওয়া যায় :

"যখন বিচারক ইজতিহাদের মাধ্যমে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তখন সে দুটি পুরস্কার পায়, তার সিদ্ধান্ত যদি ভুল হয় তবে সে অন্ততঃ একটি পুরস্কার পায়।"[১৭]

অনেক সাহাবীর ইজতিহাদ এতোই নির্ভুল হয়েছিল যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেগুলো ওহীর মাধ্যমে কুরআন কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়েছে এবং রাসূল (সাঃ) সমর্থন করেছেন। নিঃসন্দেহে এটা সম্ভব হয়েছিল রাসূলের (সাঃ) সাথে তাঁদের অত্যধিক ঘনিষ্ঠতার ফলে। সর্বজ্ঞানী আইনদাতা মহান আল্লাহ তায়ালা যে উদ্দেশ্যে কুরআনের উক্ত আইন জারি করেছিলেন তা তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং এর বক্তব্য ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যে কোন সুযোগ-সুবিধা সামনে আসলেই তাঁরা তা বিচার-বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে উপভোগ করেননি।

---

১৬. এটি একটি সুপরিচিত ও নির্ভরযোগ্য হাদীস, যা ইমাম বুখারী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ এবং আহমদ তাঁদের হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। (সম্পাদক)

১৭. এটি একটি সহীহ হাদীস, বুখারী ও মুসলিমসহ অন্যান্য অনেকে এ হাদীসকে সহীহ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (সম্পাদক)

দ্বিতীয় অধ্যায়

যে সকল সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে ফতোয়া দিতেন

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে যে সকল সাহাবী ফতোয়া প্রদান করতেন তাঁরা হলেনঃ হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ), হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ), হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ), হযরত হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ), হযরত যায়িদ ইবনে ছাবিত (রাঃ), হযরত আবু দারদা (রাঃ), হযরত আবু মূসা আল-আশয়ারী (রাঃ) এবং হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)।

কোন কোন সাহাবা তুলনামূলকভাবে বেশি ফতোয়া প্রদান করেছেন। যাঁরা বেশি সংখ্যক ফতোয়া প্রদান করেছেন তাঁরা হলেন, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এবং তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ), হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত যায়িদ ইবনে ছাবিত (রাঃ)। উপরোল্লিখিত ছয়জনের প্রত্যেকের ফতোয়ার ভাণ্ডার ছিল বিশাল। আবু বকর মোহাম্মদ ইবনে মূসা ইবনে ইয়াকুব ইবনুল খলিফা আল-মামুন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-র ফতোয়াসমূহ বিশ খণ্ডে সংগ্রহ ও সংকলন করেছিলেন।

যাঁদের নিকট থেকে অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক ফতোয়া বর্ণিত হয়েছে তাঁরা হলেন, উম্মুল মু'মেনীন হয়রত উম্মে সালমা (রাঃ), হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ), হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ), হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ), হযরত আবু মূসা আল-আশয়ারী (রাঃ), হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ), হযরত সালমান ফারসী (রাঃ), হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ), হযরত আবু

বকর সিদ্দিক (রা:)। এই তেরজন সাহাবী কর্তৃক প্রদত্ত ফতোয়া পৃথক পৃথকভাবে একটি পুস্তকের এককেটি ক্ষুদ্র অংশ হতে পারে।

এই তালিকায় আরো যে কয়েকজন সাহাবীর নাম অন্তর্ভুক্ত করা যায় তাঁরা হলেন– হযরত তালহা (রা:), হযরত যুবায়ের (রা:), আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা:), হযরত আবু বাকরাহ (রা:), হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা:) এবং হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা:)। অন্য কয়েকজন সাহাবী খুবই স্বল্পসংখ্যক ফতোয়া প্রদান করেছিলেন, সংখ্যায় একটি বা দুটি, দু'একজনের ক্ষেত্রে হয়তো তারও সামান্য বেশি। তাঁদের প্রদত্ত ফতোয়ার সংখ্যা এতই অল্প যে, ব্যাপক অনুসন্ধান করে ছোটখাটো একটি সংকলন তৈরি করা সম্ভব হতে পারে।[১]

সাহাবীগণ তাঁদের সময়ে সংঘটিত নতুন ঘটনাকে কুরআন বা সুন্নাহর সাথে হুবহু মিলে যায় এমন ঘটনার সাথে তুলনা করে তদনুসারে ফতোয়া প্রদান করেছেন। কুরআন বা সুন্নাহর কোন ঘটনা বা বিষয়ের সাথে তুলনা করতে গিয়ে তাঁরা যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন তা হলোঃ মূল পাঠে ব্যবহৃত শব্দাবলীর পরীক্ষা নিরীক্ষা, এর প্রয়োগ পদ্ধতি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তাৎপর্য ও আইনগত গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা।

কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর তাঁরা অন্যদের নিকট ব্যাখ্যা করে বলতেন, কিভাবে যুক্তিসমূহ উপস্থাপিত হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, এগুলো কি কুরআন বা সুন্নাহার শাব্দিক বা বাহ্যিক অর্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, না তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত (দালালাতুন নস) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। অত:পর লোকেরা তাঁদের মত গ্রহণ করত। বস্তুত প্রথম যুগের এ সকল ফকীহ কোন সমস্যা দেখা দিলে তার নিশ্চিত ও সন্তোষজনক সমাধানে না পৌছা পর্যন্ত সাধ্যমত তাঁদের গবেষণা চালিয়ে যেতেন।

মহান সাহাবীগণের যুগ

রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর পরে শুরু হয় মহান সাহাবীগণ ও খোলাফায়ে রাশেদার যুগ। ১১ হিজরী সন থেকে ৪০ হিজরী সন পর্যন্ত উক্ত সময় অতিবাহিত হয়। ফকীহ ও মুফতী (ফতোয়া দানকারী) সাহাবীগণকে সে যুগে বলা হতো 'কুররা' (কুরআন সম্পর্কীয় বিদ্যার বিশেষজ্ঞ)।

---

১. দ্র. ইবনে হাযম, আল ইহকাম, ৫ম, পৃ. ৯২-৯৩।

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর যুগ

শরীয়াতের বিধান জানার জন্য হযরত আবু বকর (রাঃ) যে পদ্ধতি অনুসরণ করতেন, মায়মুন ইবনে মাহরান তা এভাবে বর্ণনা করেছেন :

আবু বকর (রাঃ)-র শাসনে কোন বিবাদ উপস্থিত হলে তিনি কুরআন খুলে দেখতেন। যদি তাতে বিবাদ মীমাংসার জন্য কিছু পেতেন তবে তার ভিত্তিতে উদ্ভূত বিবাদ মীমাংসা করতেন। যদি কুরআনে এ ব্যাপারে কোন সমাধান না পেতেন তাহলে তিনি রাসূলের সুন্নাহ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মীমাংসা করতেন। যদি সুন্নাহতেও উল্লেখিত বিষয়ে কোন কিছু না পেতেন তাহলে তিনি মুসলমানদের নিকট গিয়ে বলতেন, অমুক অমুক বিষয় আমার নিকট পেশ করা হয়েছে। তোমাদের কারো এ বিষয়ে রাসূলের (সাঃ) কোন মীমাংসার কথা জানা আছে কি? ঐ বিষয়ে যদি কেউ তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য সরবরাহ করতে সক্ষম হতেন তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) বলতেন, "আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা যে, তিনি আমাদের মধ্যকার কোন কোন ব্যক্তিকে রাসূলের (সাঃ) নিকট থেকে তাঁর শ্রুত বিষয় স্মরণ রাখার সামর্থ্য দিয়েছেন।"

যদি তিনি সুন্নাহ-এ কোন সমাধান না পেতেন তাহলে নেতৃস্থানীয় ও উত্তম লোকদের সাথে পরামর্শ করতেন। তাঁরা ঐকমত্যে পৌঁছলে তার ভিত্তিতে তিনি রায় প্রদান করতেন।[২]

এভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে তিনি সমাধান না পেলে তাঁর ব্যক্তিগত বিচক্ষণতার সাহায্যে 'নস'-এর ব্যাখ্যা করে অথবা তার ভাবার্থ থেকে অথবা কেবল ইজতিহাদের ভিত্তিতে তার নিজস্ব মত গঠন করতেন।[৩] যেমন হযরত আবু বকর (রাঃ) 'কালালাহ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হওয়ার পর যে জবাব দিয়েছিলেন, সেই সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, "কালালাহ সম্পর্কে আমি যা বললাম তা আমার নিজের বুদ্ধির ভিত্তিতে। আমার মতামত যদি সঠিক হয় তবে তা আল্লাহর কাছ থেকে, আর যদি ভুল হয় তবে তা আমার নিজের কাছ থেকে এবং শয়তানের কাছ থেকে। অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই কালালাহ যার পিতা-মাতাও নেই সন্তানও নেই।"[৪]

---

২. দ্র. ইলামূল মুওয়াকিঈন, ১খ, পৃ. ৫১।

ক. কুরআন ও হাদীসের দলীলকে আইনের ভাষায় 'নস' বলে।

৩. শাহ ওয়ালিউল্লাহ দিহলাবী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ১খ, পৃ. ৩১৫।

৪. কালালাহ শব্দের অর্থ নিয়ে মতভেদ আছে। কারো কারো মতে, কোন ব্যক্তির সরাসরি উত্তরাধিকারী না থাকা অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি, পিতা বা পিতামহ জীবিত না থাকা অবস্থায় কেউ

এরূপ আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে, "হযরত উমর (রাঃ) বললেন, আমি রাসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমি (আল্লাহর পক্ষ থেকে) লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা বলে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।"[৫] তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, "যাকাতও এর অংশ।"[৬]

হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন তখন হযরত উমর (রাঃ) উক্ত হাদীস পেশ করার মাধ্যমে বললেন, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জায়েয হবে না। কেননা রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "যে পর্যন্ত না তারা বলে, আল্লা ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আর যদি তারা এটা বলে, তবে তাদের জানমাল আমার হাত থেকে রক্ষা করল। অবশ্য হকের (ইসলামের) অধিকার এর ব্যতিক্রম (অর্থাৎ ইসলামী শরীয়াহর বিধান অনুযায়ী দণ্ড পাওয়ার উপযোগী কোন অপরাধ করলে তাকে তা অবশ্যই ভোগ করতে হবে)। হযরত উমর (রাঃ)-এর মতে ইসলামের অধিকার অর্থ– "সে ব্যক্তি হত্যা ব্যভিচার এবং ধর্মত্যাগের অপরাধ করলে সে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করবে।" কারণ যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) স্পষ্টভাবে কিছু বলেননি। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, যাকাত এর (ইসলামের) অঙ্গ। আল্লাহর কসম! যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে অথচ যাকাত

মারা গেলে তাকে কালালাহ বলে গণ্য করা হবে। অন্য আরেক দলের মতে, পিতা বা পিতামহ জীবিত থাকুক বা নাই থাকুক, মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান-সন্ততি না থাকলে তাকেই কালালাহ বলা হবে। সূরা নিসার ১৭৬ নম্বর আয়াত এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক। এ আয়াতের ভিত্তিতেই হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন। তাঁর মতে কুরআনের উপরোক্ত আয়াতের মর্মানুসারে কালালার বোন তার অর্ধাংশ সম্পত্তির ওয়ারিস হবে, কিন্তু পিতা জীবিত থাকলে সে (বোন) কিছুই পাবে না। সুতরাং কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলেও এটা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, কালালাহ হলো সেই ব্যক্তি যার কোন দিক থেকে সরাসরি (পূর্বপুরুষ বা উত্তর পুরুষ) কোন উত্তরাধিকারী নেই। (সম্পাদক)

৫. হাদিসখানি সহীহ হাদিসসমূহের অন্তর্ভুক্ত। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ, আহমদ, আত-তায়ালিসী ইত্যাদি গ্রন্থে তা উল্লেখ আছে।

৬. হযরত আবু বকর (রাঃ) বলতে চেয়েছেন যে, উল্লিখিত হাদীসকে শুধুমাত্র শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করা ঠিক হবে না। তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই– এই মৌল প্রত্যয়টিকে ইসলামী আকীদার নির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এ জীবন বিধানকে অনুসরণ করার জন্য যাকাতসহ আকীদার অনেকগুলো দিক ও শাখা-প্রশাখা রয়েছে। (সম্পাদক)

প্রদান করে না, আমি অবশ্যই তার সাথে যুদ্ধ করব। যদি কেউ সামান্যতম পরিমাণ প্রদানেও অস্বীকৃতি জানায়, যা তারা রাসূল (সাঃ)-কে প্রদান করত, তবে আমি এজন্যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।"

তাঁর দ্বিতীয় ইজতিহাদের উদাহরণ হলো : তিনি সিদ্ধান্ত প্রদান করলেন যে, মায়ের মা উত্তরাধিকারী হবে কিন্তু পিতার মা উত্তরাধিকারী হবে না। তখন কিছু সংখ্যক আনসার তাঁকে বললেন, আপনি এমন একজন মৃতের উত্তরাধিকার গ্রহণের জন্য এমন একজন স্ত্রীলোককে অনুমতি দিলেন, তদস্থলে ঐ স্ত্রীলোকটি ইন্তেকাল করলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না। বিপরীতক্রমে আপনি এমন এক স্ত্রীলোককে মৃতের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করলেন, যে মৃতের স্থলবর্তী হলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি তার উত্তরাধিকারী হয়।" তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) পুনরায় সিদ্ধান্ত প্রদান করলেন যে, পিতামহী এবং মাতামহী উভয়ের একত্রে মৃতের সম্পত্তির ছয়ভাগের একভাগ প্রাপ্য হবে।

আরেকটি উদাহরণ, হযরত আবু বকর (রাঃ) ঘোষণা করলেন যে, বায়তুল মাল থেকে প্রত্যেকেই সমান অংশীদার। হযরত উমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, "যে লোক বাধ্য হয়ে অনিচ্ছায় ইসলামে প্রবেশ করেছে এবং যে লোক তার বাড়িঘর ও সহায়-সম্পত্তি পিছনে ফেলে রেখে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে হিজরত করেছে তাদের উভয়কে আপনি সমান বিবেচনা করেন কিভাবে? কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থেকে বললেন যে, "তাঁরা সকলে আল্লাহর জন্যই ইসলাম গ্রহণ করেছেন, এজন্য আল্লাহ তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন : এ দুনিয়ার জীবন কিছুই নয়।" হযরত উমর (রাঃ) খলিফা হওয়ার পর বায়তুল মাল থেকে বৃত্তি প্রদানকালে লোকদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেন। অর্থাৎ কতকাল আগে সে ইসলাম গ্রহণ করেছে, হিজরত করেছে কি না এবং ইসলামের জন্য কি পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করেছে ইত্যাদি।

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ইজতিহাদ সম্পর্কিত আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে : তিনি তাঁর পরে খলিফা কে হবেন সে ব্যাপারে সাধারণ বাইয়াত গ্রহণ অপেক্ষা নিজেই খলিফা মনোনয়ন দিয়ে যাওয়াকে অধিকতর ভাল মনে করলেন। সুতরাং তিনি হযরত উমর (রাঃ)-কে পরবর্তী খলিফা হিসেবে মনোনয়ন দিলেন এবং সাহাবীগণ তাঁর সাথে একমত হলেন।

একবার হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে চিঠি লিখে বললেন যে, আরব উপসাগরীয় কোন কোন অঞ্চলে তিনি কিছু লোককে

সমকামিতায় (homosexual practice) অভ্যস্ত দেখতে পেয়েছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবীগণের পরামর্শ গ্রহণ করতে চাইলেন। সাহাবীগণের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) ও ছিলেন এবং তিনি এ ব্যাপারে কঠোরতর মত প্রদান করেন। তিনি বললেন, "এই গুনাহে আমাদের জানামতে একটি মাত্র জাতি লিপ্ত হয়েছিল এবং আপনি জানেন আল্লাহ তাদের ব্যাপারে কিরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। আমার পরামর্শ হচ্ছে, এ সকল লোককে আগুনে পুড়িয়ে মারা হোক।" হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত খালিদ ইবনে অলীদকে চিঠি লিখে জানালেন যে, তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হোক এবং তাই করা হয়।[৭]

ঐ যুগের ফিকাহের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

(ক) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ থেকে সরাসরি কোন নির্দেশ পাওয়া না গেলে কিয়াস পদ্ধতি ব্যাপক ব্যবহার করা হয়। কোন সাহাবী এ ব্যাপারে আপত্তি তোলেননি।

(খ) বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইজমার ব্যাপক ব্যবহার। বস্তুতপক্ষে এটা সহজ হয়েছিল এ কারণে যে, সাহাবীগণের সংখ্যা ছিল স্বল্প, ফলে কোন বিষয়ে ঐক্যমত্যে পৌছানো তাঁদের পক্ষে সহজ ছিল। তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে ইজমা পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। উদাহরণস্বরূপ খলিফা বা ইমাম মনোনয়নের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং তাদেরকে হত্যা করা, কোন ধর্মত্যাগীকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে গ্রহণ করা এবং কুরআনের আয়াতসমূহ সংগ্রহ এবং গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা ইত্যাদি।

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-র যুগ

প্রধান বিচারপতি শুরায়হ-এর যেসব রায় উমর (রাঃ) অনুমোদন করেছেন এবং যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, তাতে দেখা যায় যে, তিনি প্রাপ্ত দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। হযরত উমর (রাঃ) কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতির মধ্যে লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল যে, ফায়সালা গ্রহণের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে তিনি সাহাবীগণের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ করতেন, বিতর্কসভা করতেন। বিভিন্ন আইনগত প্রশ্নে তাঁর ভূমিকা ছিল একজন বিচক্ষণ

---

৭. ইবনে কাইয়িম, প্রাগুক্ত।

ও সাবধানী রসায়নবিদের মতো, যিনি এমন ওষুধ প্রস্তুত করতে চান যা রোগীর উপর কোন বিরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই রোগ নিরাময় হয়ে যাবে। ফলে হযরত উমর (রাঃ) আমাদের জন্য ইসলামী আইনের এক বিশাল সম্পদ রেখে যেতে সক্ষম হন। ইবরাহীম নাখঈ (মৃঃ ৯৭ হিজরী) বলেছিলেন যে, "উমর (রাঃ) শহীদ হওয়ার সাথে সাথে জ্ঞানের দশ ভাগের নয় ভাগ দুনিয়া থেকে তিরোহিত হয়ে গেছে।"[৮]

ইবনে মাসউদ (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ) সম্পর্কে বলেছেন, "আমরা লক্ষ্য করেছি যে, উমর (রাঃ) সহজ পথই বেছে নিতেন।"[৯]

হযরত উমর (রাঃ)-র বোধশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর এবং তিনি ছিলেন গভীর পাণ্ডিত্বের অধিকারী। তাই তিনি খুব দ্রুত কোন সম্পূরক বিষয়কে মূল বিষয়ের সাথে তুলনা করতে পারতেন। মূলনীতিসমূহের আলোকে তিনি যে কোন বিষয়ের সম্পূরক পর্যন্ত অনুসন্ধান করতে পারতেন। রাসূল (সাঃ) এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর যুগে তিনি এভাবেই ফতোয়া দিতেন এবং তিনি খলিফা হওয়ার পরও তাঁর এ নীতির পরিবর্তন করেননি।

উমর (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর নিকট থেকে অনেক কিছু শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, রাসূল (সাঃ) মাঝে মাঝে লোকদেরকে কোন ভাল কাজের ব্যাপারে নির্দেশ দিতে বিরত থাকতেন, যদিও তিনি চাইতেন যে, লোকেরা কাজটি করুক, কিন্তু তা তাদের জন্য কষ্টকর হতে পারে ভেবে নির্দেশ দিতেন না। তিনি প্রায়ই বলতেন, "যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হবে বলে আশঙ্কা না করতাম তাহলে আমি তাদেরকে নির্দেশ দিতাম যেন তারা সংশ্লিষ্ট কাজটি করে, ইত্যাদি।"[১০]

কোন কোন সময়ে তিনি লোকদের কোন কাজ করতে নিষেধ করতেন কিন্তু যখন দেখতেন যে কারণে কাজটি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল সে কারণ এখন আর বর্তমান নেই তখন ঐ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিতেন। আবার কখনো তিনি হয়তো কোন বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে যাচ্ছেন, এমন সময় যদি তাঁকে বলা

---

৮. শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১খ, পৃ. ২৭৮।

৯. পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ।

১০. সম্ভবত সালাতের পূর্বে দাঁত পরিষ্কার করা সম্পর্কিত বহুল প্রচলিত হাদিসখানি এ আঙ্গীকেই বর্ণিত হয়েছে। (সম্পাদক)

হতো যে, এরূপ নিষেধাজ্ঞা লোকদের অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে তখন তিনি তাদেরকে অসুবিধা থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে উক্ত নিষেধাজ্ঞা জারি করা থেকে বিরত থাকতেন।

উমর (রাঃ) দেখেছেন, রাসূল (সাঃ)-এর সামনে যখন দুটি বিষয়ের মধ্যে কোন একটি অবলম্বনের প্রসঙ্গ আসত তখন তিনি সবসময় দুটির মধ্যে সহজতরটি অবলম্বন করতেন। বস্তুত এসকল বিষয় হযরত উমর (রাঃ)-কে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি ভালভাবেই বুঝতেন যে, শরীয়াহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে এবং সেগুলোকে বিবেচনায় আনতে হবে। তিনি মনে করতেন যে, কুরআন ও সুন্নাহে প্রদত্ত নির্দেশাবলীর কোনটি স্পষ্ট এবং কোনটি শুধুমাত্র ইঙ্গিতবাহী হওয়ার পেছনে যথেষ্ট কারণ ও যুক্তি রয়েছে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, এ সকল ইঙ্গিতের কারণ খুঁজে বের করা আলেমগণের কর্তব্য। তাহলে নতুন বিষয়ে ও নতুন আঙ্গিকে আইনের সিদ্ধান্তসমূহ প্রয়োগ করা সম্ভব হবে, সব কিছুই আল্লাহর ফায়সালার আওতায় এসে যাবে। ফলে মানুষ আল্লাহর আইন বহির্ভূত কোন কিছুর কাছে সমাধান কিংবা আইনগত সিদ্ধান্ত চাইতে অভ্যস্ত হবে না।

সুতরাং হযরত উমর (রাঃ)-এর ইজতিহাদের অনুশীলনের প্রতি নজর দিলে আমরা দেখব যে, তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য সুস্পষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। তাঁর প্রদত্ত ফতোয়া অনুসরণ করতে গেলে প্রথমেই দেখা যাবে যে, ভুল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাবধানতা হিসেবে অথবা দুর্নীতি প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে এবং আইনের আওতায় সহজতর ও সবচেয়ে বেশি উপযোগী পন্থা হিসেবে জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে সকল ফতোয়া প্রদান করেছেন। যেমন– হযরত উমর (রাঃ) কিছু কিছু ফতোয়া বাতিল বলে ঘোষণা করেছিলেন। কারণ এগুলোর কোন কোনটি যে কারণে জারি করা হয়েছিল সে কারণ তখন আর বর্তমান ছিল না এবং যে অবস্থার প্রেক্ষিতে সেগুলো জারি করা হয়েছিল সে অবস্থাও তখন আর অব্যাহত ছিল না। এরূপ কয়েকটি সিদ্ধান্ত হলো :

(ক) বদর যুদ্ধের বন্দিদের হত্যা করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি তাঁর অনুরোধ;

(খ) হিযাবের ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ;

(গ) যে কেউ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে, একথা যেন রাসূল (সাঃ) লোকদের কাছে না বলেন, কেননা তাহলে লোকেরা এর উপর ভরসা করে বসে থাকবে আর কোন আমল করবে না।

(ঘ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে পরামর্শ প্রদান করা যে, তিনি যেন যারা সম্প্রতি ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদেরকে বায়তুল মাল থেকে কোন অতিরিক্ত সুযোগ প্রদান না করেন।

(ঙ) বিজিত দেশকে সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে না দেয়ার ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি।

হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ)-এর যুগ

হযরত উসমান (রাঃ)-কে এই শর্তে খলিফা নির্বাচন করা হয়েছিল যে, তিনি আল্লাহর কিতাব, রাসূলের (সাঃ) সুন্নাহ এবং পূর্ববর্তী দু'জন খলিফা কর্তৃক অনুসৃত নীতি অনুসারে কাজ করবেন। তিনি এই সকল শর্ত মেনে চলার অঙ্গীকার করলেন। কিন্তু হযরত আলী (রাঃ) বলেছিলেন যে, তিনি খলিফা নির্বাচিত হলে আল্লাহর কিতাব, রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সুন্নাহ অনুসারে এবং যথাসাধ্য তাঁর নিজস্ব জ্ঞান ও সামর্থ্য অনুসারে কাজ করবেন। হযরত উসমান (রাঃ) পূর্ববর্তী দু'জন খলিফা কর্তৃক অনুসৃত নীতি অনুসারে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) তাঁর নিজস্ব অতিরিক্ত ভোট (Casting vote) হযরত উসমানের (রাঃ) অনুকূলে প্রদান করেন এবং হযরত উসমান (রাঃ) খলিফা নির্বাচিত হন। এভাবে পূর্ববর্তী দু'জন খলিফা কর্তৃক অনুসৃত নীতি আইনের তৃতীয় উৎস হিসেবে তৃতীয় খলিফার যুগে প্রবর্তিত এবং অনুমোদিত হয়।

যেহেতু হযরত আলী (রাঃ) এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করতেন সেহেতু তিনি খলিফা হওয়ার পর পূর্ববর্তী খলিফাগণের কোন বিষয়ে ইজতিহাদ প্রসূত রায় বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তিনি নতুন করে ইজতিহাদ করেন। যেমন– হযরত আলী (রাঃ) কোন দাসী তার মনিবের ঔরসজাত সন্তান প্রসব করলে তাঁকে বিক্রয় করা যাবে কি না তা পুনর্বিবেচনা করেন।

হযরত উসমান (রাঃ) ছিলেন সেই সকল সাহাবীর একজন যিনি খুব বেশি সংখ্যক ফতোয়া প্রদান করেননি। এর কারণ সম্ভবত এটাই যে, তিনি যে সকল

সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন সেগুলো ইতিপূর্বে হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত উমর (রাঃ) মুকাবেলা করেছিলেন এবং উসমান (রাঃ) তাদের মতামত অনুসারে কাজ করাকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছিলেন। তবে তাঁর পূর্বসূরীগণের মতো তাকেও কোন কোন ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করতে হয়েছিল। উসমান (রাঃ) খলিফা হওয়ার পূর্বে একবার হযরত উমর (রাঃ) তাঁকে আইনের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "আপনি যদি নিজের মতানুসারে করতে চান তাহলে ঠিক আছে। আর যদি আপনার পূর্ববর্তী খলিফাকে (অর্থাৎ আবু বকরকে) অনুসরণ করেন তা হবে উত্তম। কেননা তিনি ফায়সালা প্রদানে কতই যে ভাল ছিলেন।"

হজ্জের সময় তিনি নিজেও ইজতিহাদ করেছিলেন। মিনায় সালাত সংক্ষিপ্ত করার ব্যাপারে সুস্পষ্ট অনুমতি থাকা সত্ত্বেও তিনি তা করেননি। এর সম্ভাব্য দু'টি কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ হয়তো এই যে, তিনি মক্কায় বিবাহ করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে, মক্কার লোকদের মিনায় সালাত সংক্ষিপ্ত করার অনুমতি নেই। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে, তাঁকে এরূপ করতে দেখলে কিছু কিছু বেদুইন ভুল বুঝতে পারে, তাই তিনি তা করেননি। হযরত উসমান (রাঃ) ফতোয়া প্রদান করেছিলেন যে, যায়দ ইবনে সাবিত (রাঃ) যে পদ্ধতিতে কুরআন তেলাওয়াত করেন সকলের সেই পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, ঐ পদ্ধতি সবচেয়ে ভাল এবং এ ব্যাপারে কারো আপত্তি করার সম্ভাবনা তেমন নেই বললেই চলে।

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ)-এর যুগ

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর মতো হযরত আলী (রাঃ)-ও একই পদ্ধতিতে কুরআনের বাণীকে উপলব্ধি করতেন এবং তা প্রয়োগ করতেন। গভীর চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে সাধারণ নীতিমালার আলোকে কোন বিশেষ ঘটনাকে বিশ্লেষণ করতেন। খলিফার দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি মদীনায় একজন শ্রেষ্ঠ বিচারক হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

হযরত আলী (রাঃ)-কে ইয়েমেনের বিচারক হিসেবে নিয়োগদান কালে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহর নিকট এই বলে দোয়া করেছিলেন, 'হে আল্লাহ! তার জিহ্বাকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ এবং তার অন্তরকে পরিচালিত করো" বাস্তবেও

আলী (রাঃ) নিজেকে একজন উত্তম বিচারক হিসেবে প্রমাণ করেন এবং বহু কঠিন সমস্যার সমাধান করেন।

নিজের জ্ঞান সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ) বলেন, "আল্লাহর কসম! কুরআনের এমন কোন আয়াত নেই যা কি বিষয়ে, কোথায় এবং কেন নাযিল হয়েছিল তা আমি জানতাম না। আমার আল্লাহ আমাকে বোধশক্তি সম্পন্ন অন্তঃকরণ দিয়েছেন এবং দিয়েছেন স্পষ্ট জবান।" হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট কোন বিষয় বিচারের জন্য উপস্থিত হলে তিনি কোনরূপ ইতস্তত না করে তার ফায়সালা করতেন এবং তাকে কোন বিষয়ে ফতোয়া দিতে বলা হলে তিনি আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নাহ থেকে উদ্ধৃতিসহ ফতোয়া দিতেন। বস্তুত কোরআন এবং সুন্নাহ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের কথা সর্বজনবিদিত। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নাহ সম্পর্কে আলী (রাঃ) অন্য সকলের অপেক্ষা বেশি জ্ঞানী ছিলেন।"

হযরত আলী (রাঃ) সাধারণত তাঁর নিজের মতামত দিতে গিয়ে আল-কিয়াস, আল ইসতিসহাব[১১] আল-ইসতিহ্সান[১২] এবং আল-ইসতিসলাহ[১৩] -এর ভিত্তিতে ইজতিহাদ করতেন। শরীয়াহর বৃহত্তর লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি তাঁর মতামত প্রদান করতেন। এক মদ্যপানকারী দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর তার শাস্তি যথাসম্ভব বাড়িয়ে দেয়ার পরামর্শ আসে। তিনি মিথ্যা অপবাদ (কাযাফ)-এর উপর কিয়াস করে মদ্যপায়ীর শাস্তি নির্ধারণ করেন।

হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে যৌথভাবে হত্যা পরিকল্পনার সাথে জড়িত একদল লোককে কিভাবে শাস্তি দেয়া যায় সে ব্যাপারে তিনি হযরত আলী (রাঃ) মতামত চাইলেন। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, "হে আমীরুল মুমিনীন! যদি একদল লোক চুরি করার জন্য একত্র হয় তবে আপনি কি তাদের প্রত্যেকের একটি করে হাত কেটে দেবেন না?" হযরত উমর হ্যাঁ-সূচক জবাব দিলে আলী (রাঃ) বললেন, তবে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত উমর (রাঃ) তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন : "যদি

---

১১. আল-ইসতিসহাব ঃ আইনগত যুক্তি উত্থাপনকালে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি বিবেচনা করা।

১২. আল-ইসতিহ্সান ঃ বিচারকার্যে কোন বাহ্যিকভাবে সদৃশ্য প্রমাণ অপেক্ষা কিয়াসকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ইসতিহ্সান শব্দটিকে কখনো কখনো বিচার সম্পর্কীয় অগ্রাধিকার (Juristic preference) রূপে অনুবাদ করা হয়ে থাকে।

১৩. আল-ইসতিসলাহ ঃ আইনের বিবেচনায় ব্যক্তি এবং সামগ্রিকভাবে সমাজ এই উভয়ের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা।

সানার সকল নাগরিক একত্রে একজন লোককে হত্যা করতে হবে আমি এই অপরাধে তাদের সকলকে হত্যা করতাম।"

এখানে হত্যা এবং রাহাজানির মধ্যে কিয়াস করা হয়েছে। কারণ উভয় ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের সকলের অপরাধ সংঘটনের মোটিভ একই। এ কারণে ভর্ৎসনা এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

এছাড়া আলী (রাঃ) অতি ঈর্ষাপরায়ণ মুরতাদ ও ধর্মদ্রোহীদের যারা তাঁর উপর দেবত্ব আরোপ করতে চেয়েছিল তাদেরকে তিনি জীবন্তাবস্থায় পুড়িয়ে মারার পক্ষপাতী ছিলেন। যদিও তিনি ভালোভাবেই জানতে যে, সুন্নাহ অনুসারে অবিশ্বাসী ও মুরতাদদেরকে শুধুমাত্র হত্যা করার নির্দেশ রয়েছে। তাঁর দৃষ্টিতে এটি একটি মারাত্মক অপরাধ। সুতরাং তিনি এ কাজের জন্য কঠোরতম শাস্তি আরোপ করলেন যাতে লোকেরা এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকে। এছাড়া এর উপর গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে কবিতার নিম্নোক্ত দুটি চরণ আবৃত্তি করেছিলেন :
"যখন দেখলাম আমি ব্যাপারটি খুব ভয়ঙ্কর,
আগুন জ্বালিয়ে আমি ডাকলাম খাদেম কাম্বর।"

একবার হযরত উমর (রাঃ) খবর পেলেন যে, একটি স্ত্রীলোকের বাড়িতে, যার স্বামী সামরিক অভিযানে গমন করেছিলেন, অপরিচিত লোকদের আগমন ঘটে থাকে। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, দূত মারফত উক্ত মহিলাকে নিষেধ করবেন যাতে সে স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন অপরিচিত লোককে তার ঘরে আসতে না দেয়। যখন উক্ত স্ত্রীলোক শুনল যে, খলিফা তার সাথে কথা বলতে চান, তখন সে খুব ভীত হয়ে পড়ল। সে ছিল গর্ভবতী, উমর (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসার পথে তার গর্ভপাত হয়ে যায়।

উমর (রাঃ) উক্ত ঘটনায় খুবই বিব্রত বোধ করলেন এবং এই ব্যাপারে সাহাবীগণের নিকট পরামর্শ চাইলেন। উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) এবং আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)-সহ কয়েকজন সাহাবী তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন যে, আপনি কোন ভুল করেননি।

এরপর উমর (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-র মতামত জানতে চাইলেন। আলী (রাঃ) বললেন, "এ লোকেরা যা বলেছে তা যদি তাদের সাধ্যানুসারে সর্বোত্তম মত হয়ে থাকে তবে যথেষ্ট নিরপেক্ষ মত দেয়া হয়েছে। আর যদি তারা আপনাকে খুশি করার জন্য বলে থাকে তবে তারা আপনাকে প্রতারিত করেছে।

আমি আশা করি আল্লাহ আপনার এ গুনাহ মাফ করবেন। যেহেতু তিনি জানেন আপনার উদ্দেশ্য ছিল ভাল। কিন্তু আল্লাহর কসম! আপনি উক্ত গর্ভস্খলনের জন্য ক্ষতিপূরণ দান করুন।"

উমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! আপনি আমার সাথে অকপটে কথা বলেছেন। আমি শপথ করছি আপনি এ অর্থ আপনার লোকদের মাঝে বিতরণ না করা পর্যন্ত আসন গ্রহণ করবেন না।

সাহাবী ও তাবেঈগণের মধ্যে যাঁরা ফকীহ ছিলেন

৪০ হিজরীতে খোলাফায়ে রাশেদার যুগের সমাপ্তির সাথে সাথে তাবেঈদের যুগের শুরু হিসেবে ধরা হয়। সাহাবী এবং প্রবীণ তাবেঈগণের মধ্য হতে আবির্ভূত হন কয়েকজন ফকিহ এবং সূচনা হয় নতুন যুগের। এ পর্যায়ের আইন ব্যবস্থাপনা তৎপূর্ববর্তী যুগের আইন ব্যবস্থাপনার প্রায় অনুরূপ ছিল বলা চলে। যেহেতু এ সময়েও কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা এবং কিয়াসকে পূর্বের মতোই আইনের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, তথাপি এ সময়ের আইন ব্যবস্থাপনায় পূর্বেকার সময়ের চাইতে বেশকিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কিছু ব্যতিক্রম ছিল নিম্নরূপ :

১। আলেমগণ কুরআন এবং সুন্নাহর বাহ্যিক অর্থ অপেক্ষা অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুসন্ধানে বেশি আগ্রহী হয়ে পড়েন।

২। হাদীস চর্চায় পদ্ধতির ক্ষেত্রেও তাঁরা ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেন। প্রকৃতপক্ষে এ সকল পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে। একই সাথে সে সময়ে শুরু হয়েছিল শিয়া এবং খারিজীসহ বিভিন্ন ধরনের দার্শনিক ও সম্প্রদায়গত দলাদলি, যারা সুন্নাহ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করত। শিয়াগণ যে সকল হাদীস তাদের মতানুসারীদের দ্বারা বর্ণিত হয়নি সে সকল হাদীসকে গ্রহণযোগ্য মনে করতো না। আবার খারিজীগণ হাদীসের বর্ণনাকারীগণের ধারাবাহিকতায় একাধিক বর্ণনাকারী না থাকলে সে হাদীস গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়।[১৪] যে সকল হাদীস কুরআন দ্বারা সমর্থিত হয়নি খারিজীগণ সে সকল হাদীসকেও বাতিল বলে ঘোষণা করে।

---

১৪. এ সকল হাদীসকে বলা হয় খবর আল-ওয়াহিদ বা একজন মাত্র ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। এ ধরনের হাদীসের মর্যাদা সম্পর্কে গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়সমূহে আলোচনা করা হয়েছে।

৩। এভাবে বিভিন্ন দলে বিভক্তির কারণে এ সময় ইজমার আর কোন সুযোগ থাকল না। প্রতিটি দলের আলেমগণ অন্য সকল দলের আলেমগণের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করতেন এবং কোন বিষয়ে একে অপরের সাথে একমত বা দ্বিমত যাই পোষণ করুন না কেন তারা কেউ কারো মতামত গ্রহণ করতেন না। উপরন্তু সাহাবীগণের মধ্যে যাঁরা ফকিহ ছিলেন, তাঁরা দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিলেন বিধায় একত্র হয়ে কোন বিষয়ে আলোচনা করাও সম্ভভ ছিল না।

৪। এছাড়া এ যুগে যে কেউ হাদীস এবং সুন্নাহর বর্ণনা করতেন অথচ পূর্ববর্তী যুগে এরূপ হতো না।

৫। সর্বজনবিদিত বহু কারণে এ সময় ভুয়া হাদীসের বর্ণনা যথেষ্ট ব্যাপকতা লাভ করে। সে সকল কারণ আমরা এখানে আপাতত আলোচনা করছি না। ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, হাদীসের ব্যাপারে কোনরূপ আশঙ্কা ছাড়াই আমরা সাধারণত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীস বর্ণনা করতাম। কিন্তু যখন লোকেরা দায়িত্বহীনভাবে রাসূলের (সাঃ) নামে বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করা শুরু করল তখন আমরা হাদীস বর্ণনা করা বন্ধ করে দিলাম।

তৃতীয় অধ্যায়

সাহাবীগণের পরবর্তী যুগে আইন প্রণয়ন

৯০-১০০ হিজরী নাগাদ সাহাবীগণের যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং ফিকাহ শাস্ত্রের চর্চাকারী ও ফতোয়াদানকারী তাবেঈগণের যুগ শুরু হয়। কুফায় সর্বশেষ সাহাবী ইন্তেকাল করেন ৮৬ কিংবা ৮৭ হিজরী সনে। মদিনার সর্বশেষ সাহাবী হযরত সাহল ইবনে সাদ আল-সাঈদী (রাঃ) ৯১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। বসরার সর্বশেষ সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) ৯১ হিজরী সনে (মতান্তরে ৯৩ হিজরী সনে) ইন্তেকাল করেন। দামেস্কের সর্বশেষ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) ৮৮ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। সর্বশেষ সাহাবী আমির ইবনে ওয়াসিলাহ ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) (আবু তুয়াফেল) ১০০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

এরপর যারা ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁরা ছিলেন মাওয়ালী বা মুক্ত দাস, যাঁদের অধিকাংশই সাহাবীগণের সাথে বসবাস করেছিলেন। যেমন– হযরত ইবনে উমরের (রাঃ) মুক্তদাস হযরত নাফে (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) মুক্তদাস হযরত ইকরামা (রঃ), মক্কার ফকীহ হযরত আতা ইবনে রাবাহ (রঃ), ইয়ামানবাসী মানুষদের ফকীহ হযরত তাউস (রঃ), ইয়ামামার ফকিহ ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাছীর (রঃ), কুফার ফকিহ হযরত ইবরাহীম আল-নাখঈ (রঃ), বসরার ফকীহ হযরত হাসান আল-বসরী (রঃ) এবং বসরার আরেকজন ফকিহ হযরত ইবনে সীরীন (রঃ), খুরাসানের হযরত আতা আল-খুরাসানী (রঃ) এবং আরো অনেকে। অবশ্য মদীনায় কুরাইশ বংশীয় ফকীহ হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব ছিলেন এ ক্ষেত্রে অনন্য।

সাহাবীগণের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত এ সকল তাবেঈ সাহাবীগণের প্রদত্ত ফতোয়া কচিৎ পরিবর্তন করেছিলেন। সুতরাং তাঁরা শরীয়াতের বিধান প্রণয়নে যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন তার সাথে তাঁদের পূর্বসুরীগণের অনুসৃত পদ্ধতির পার্থক্য নিরূপণ করা কষ্টসাধ্য। তথাপি এ সময়ে শরীয়াতের বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে

প্রচলিত পদ্ধতিসমূহ পূর্বের তুলনায় আরো স্পষ্টতর রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করেছিল।

হযরত হাসান ইবনে উবায়দুল্লাহ আল-নাখঈ (রঃ) বলেন, আমি ইবরাহীম নাখঈকে (রঃ) বললাম, আমি আপনাকে যে সকল ফতোয়া দিতে শুনি তা কি আপনি অন্য কাউকে দিতে শুনেছেন? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, যা আপনি শোনেননি সে সব বিষয়ে ফতোয়া দিচ্ছেন? তিনি বললেন, আমি যা শোনার তা শুনেছি, কিন্তু যখন এমন কোন বিষয়ের সম্মুখীন হই, যা আমি আগে শুনিনি তখন আমি যে বিষয়ে আগে শুনেছি সে বিষয়ের সাথে উদ্ভূত বিষয়টির তুলনা করি এবং কিয়াস করি (বুদ্ধির সাহায্য গ্রহণ করি)।[১]

এ যুগের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো হলো : এ যুগে বিভিন্ন বিষয়ে আইনবিদগণের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য ঘটে। হযরত উমর বিন আবদুল আযীয (রঃ) তাঁর খেলাফতকালে নিম্নোক্ত দু'টি সিদ্ধান্ত প্রদানের মাধ্যমে এ অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন :

১। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামে প্রচলিত সকল হাদীস সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করলেন। তদনুসারে প্রতিটি এলাকার লোকেরা সুন্নাহ সম্পর্কে যে যা জানতেন তা লিপিবদ্ধ করলেন।[২]

২। তিনি বেশিরভাগ জেলায় ফতোয়া দেয়ার ক্ষমতা স্বল্পসংখ্যক নির্বাচিত লোকের মধ্যে সীমিত করে দিলেন। যেমন– তিনি মিসরে এ কাজের জন্য মাত্র তিনজন লোককে মনোনীত করলেন। মজার ব্যাপার হলো, এ তিনজনের মধ্যে দু'জনই ছিলেন মুক্তদাস, যথাক্রমে ইয়াযিদ ইবনে আবু হাবিব এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আবু জাফর। তাঁদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি জাফর ইবনে রাবিয়াহ ছিলেন একজন আরব। তিনজনের মধ্যে দু'জন মুক্তদাস এবং মাত্র একজন আরবকে এ কাজের জন্য নিয়োগ করার কারণ সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে খলিফা বলেছিলেন, "মুক্তদাসগণ যদি নিজেদের উন্নতি করতে পারে আর তোমরা না পার তাতে আমার ত্রুটি কোথায়?[৩]

---

১. ইবনে হাজআর, আল-ইসাবাহ, ৪র্থ খণ, পৃঃ ১১২; এবং ইবনে আবদুল বার, আল ইসতিয়াব (আল-ইসাবাহ-এর পাদটীকা), পৃঃ ৪১৫।
২. ইবনে আবদুল বার, জামি বায়ান আল-ইলম, ১খ, ৩৩।
৩. আল মাকরিজি, খিতাত, ৪র্থ খণ্ড, ১৪৩ পৃঃ।

আবু বকর (রাঃ) মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাজম আল-আনসারীর কাছে লিখিত এক পত্রে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) আমল সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো লিপিবদ্ধ করার জন্য প্রদত্ত তাঁর আদেশের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লিখেছেন, রাসূলুল্লাহর (সাঃ) হাদীস বা সুন্নাহ বা আমল যা কিছু হোক খুঁজে দেখ। তারপর ঐগুলো আমার জন্য লিখে রাখ, কারণ আমার ভয় হয় আলেমগণ দুনিয়া থেকে চলে গেলে এ সকল জ্ঞানও দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে।"[৪]

তাবেঈগণের পরবর্তী যুগ : মুজতাহিদ ইমামগণের যুগ

এ যুগ সম্পর্কে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রঃ) নিম্নরূপ ভাষায় বর্ণনা করেছেন : "এ যুগের ফকিহগণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাদীস, ইসলামের প্রথম যুগের বিচারকগণের রায়, সাহাবীগণ, তাবেঈ ও তৃতীয় প্রজন্মের আইন বিষয়ক পাণ্ডিত্য ইত্যাদি সব কিছুকে তাঁদের বিবেচনায় আনেন। অতঃপর তাঁদের নিজস্ব ইজতিহাদ করেন। এভাবেই তৎকালীন আইনবিদগণ গবেষণা করেছেন। মূলতঃ তাঁরা সকলেই মুসনাদ[৫] এবং মুরসাল[৬] এ উভয় প্রকার হাদীস গ্রহণ করেন।

---

৪. ইমাম বুখারী (রঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনাকারীগণের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে যথারীতি কোন বর্ণনা ব্যতিরেকে পত্রখানির কথা উল্লেখ করেছেন। (অর্থাৎ তালীকান মুয়াল্লাক হাদীস। ইমাম মালিক (রঃ) প্রণীত মুয়াত্তায়ও এটি বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, আল-যারকানীর টীকা, ১ম খণ্ড, ১০।

৫. মুসনাদ ঃ যে হাদীসের সনদ বা বর্ণনাকারীগণের ধারাবাহিকতা অব্যাহতভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে।

৬. মুরসাল ঃ যে হাদীসের সনদ বা বর্ণনাকারীগণের ধারাবাহিকতা কোন এক প্রান্তে এসে ব্যাহত হয়েছে। যেমন- কোন হাদীস তাবেঈ কর্তৃক কোন তাবেঈর পক্ষে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) নিকট থেকে বর্ণনা করা। বস্তুতঃ কোন তাবেঈর পক্ষে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) নিকট থেকে সরাসরি হাদীস শুনা সম্ভব নয়। হাদীসখানিকে তিনি রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে এভাবে সম্পৃক্ত করতে পারেন যে, তিনি হয়তো হাদীসখানি অন্য কোন তাবেঈর নিকট শুনেছেন অথবা কোন একজন সাহাবীর নিকট শুনেছেন। কিন্তু যেহেতু বিজ্ঞ তাবেঈ যাঁর নিকট থেকে হাদীসখানি শুনেছেন তার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করেননি, সেহেতু তিনি তার নাম উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। যাই হোক পরবর্তী যুগের ফকীহ ও হাদীস বিশারদগণের কাছে মুরসাল হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়রূপে দেখা দেয়। এ ব্যাপারে তাঁরা যে বিষয়টি বিবেচনায় এনেছিলেন তা হলোঃ এরূপ হাদীসের বর্ণনাকারীগণের ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়েছে এবং যদি তাবেঈ বর্ণনাকারী তাঁর যুগের অন্য আরেকজনের নিকট থেকে হাদীসখানি শুনে থাকেন তবে সেই তাবেঈ বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে কোন

অধিকন্তু তাঁরা সাহাবী ও তাবেঈগণের মতামতকে প্রমাণ হিসেবে উদ্ধৃত করার ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। এর পিছনে মূলতঃ দু'টি কারণ ছিল :

(১) এ সকল মতামত ছিল প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) হাদীস, যা বর্ণিত হয়েছিল কোন সাহাবী বা তাবেঈ থেকে। কিন্তু তাঁরা মূল বক্তব্য বর্ণনায় তাদের পক্ষ থেকে ভুল বা কম-বেশি হওয়ার আশঙ্কায় সাবধানতাবশতঃ তাতে রাসূলুল্লাহর নাম যোগ করেননি।

(২) আরেকটি কারণ এই হতে পারে যে, এ সকল মতামত সাহাবীগণ কর্তৃক মূল হাদীস অনুসারে দেয়া হয়েছে এবং সুন্নাহ সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব বিচারবুদ্ধি অনুসারে উপস্থাপিত হয়েছে (অর্থাৎ তা হাদীস নয়, বরং হাদীসের ভিত্তিতে প্রদত্ত অভিমত)।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, পরবর্তী যুগে যাঁরা এসেছেন তাঁদের চাইতে সাহাবীগণ অবশ্যই উত্তম। কারণ তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জানতেন এবং তাঁর বক্তব্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ব্যাপারে তাঁরা অধিকতর পারঙ্গম ছিলেন। তাই যে সকল ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেরাই মতভেদ করেছেন অথবা রাসূলুল্লাহর (সাঃ) কোন সহীহ হাদীসের সাথে স্পষ্টভাবে বিরোধমূলক বক্তব্য রেখেছেন সেগুলোকে ছাড়া তাঁদের মতামত বা রায়সমূহকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

অপরদিকে দুই বা ততোধিক হাদীসের বক্তব্য পরস্পর বিরোধী হলে গবেষকগণ দুটি হাদীসের মধ্যে কোনটি সঠিক সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সাহাবীগণের মতামত চাইতেন। যদি সাহাবীগণ বলতেন যে, একটি হাদীস রহিত করা হয়েছে অথবা শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করা যাবে না, অথবা কোন একটি হাদীস সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে কিছু না বলে নীরব থেকেছেন এবং উক্ত হাদীস অনুসারে আমল করেননি, তবে ধরে নেয়া হয়েছে যে, হাদীসটি কোন না কোনভাবে ত্রুটিপূর্ণ অথবা ত্রুটির কার্যকারিতা রহিত করা হয়েছে বা এর ব্যাখ্যা

নিশ্চয়তা নেই। প্রাথমিক যুগের ফীকাহ ও হাদীস বিশারদগণের নিকট অবশ্য এটা কোন বড় সমস্যা ছিল না। কেননা তাঁরা তাবেঈ বর্ণনাকারীগণ এবং শুয়ূখ অর্থাৎ যাদের নিকট থেকে শুনে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের সকলের সম্পর্কে ভালভাবে জানতেন। ফলে ইমাম আবু হানিফা এবং মালিক (রঃ) মুরসাল হাদীস গ্রহণ করেছেন। আবার পরবর্তী দু'জন ইমাম যথাক্রমে ইমাম শাফেঈ এবং আহমাদ (রঃ) মুরসাল হাদীস বর্জন করেছেন।

শাব্দিক অর্থে করা যাবে না। এভাবে মুজতাহিদ ইমামগণ তাঁদের (সাহাবীগণের) সে মতামত গ্রহণ করতেন।

কোন বিষয়ে সাহাবী এবং তাবেঈগণের স্পষ্ট বক্তব্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হলে ফকীহ্ নিজে যে এলাকায় বসবাস করতেন সেই এলাকার সাহাবী বা তাবেঈনের এবং নিজ উস্তাদের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করতেন। কারণ তাহলে বর্ণনাকারীর সাথে তার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার ফলে উক্ত সাহাবী বা তাবেঈনের যে সকল মতামত ও বক্তব্য তাঁর নিকট এসে পৌঁছেছে সেগুলোর নির্ভরযোগ্যতা নিরূপণ করতে তিনি বেশি সক্ষম হবেন। অনুরূপভাবে ফকীহ্ নিজে উসূলে ফিকাহ্-এর ক্ষেত্রে তাঁদের অনুসৃত নীতি সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত থাকবেন।

ইসলামী আইনের মৌল চিন্তাগোষ্ঠীর (School of Thought) মধ্যে হযরত উমর (রাঃ), উসমান (রাঃ), ইবনে উমর (রাঃ), আয়েশা (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও যায়িদ ইবনে ছাবিত (রাঃ) এবং তাঁদের তাবেঈ অনুসারীগণের মধ্যে সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (মৃঃ ৯৩ হিঃ), উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের (মৃঃ ৯৪ হিঃ), সালিম (মৃঃ ১০৬ হিঃ), আতা ইবনে ইয়াসার (মৃঃ ১০৩ হিঃ), কাসিম ইবনে মুহাম্মদ (মৃত ১০৩ হিঃ), উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (মৃঃ ৯৯ হিঃ), যুহরী (মৃঃ ১২৪ হিঃ), ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (মৃঃ ১৪৩ হিঃ), যায়িদ ইবনে আসলাম (মৃঃ ১৩৬ হিঃ) এবং রাবীয়াহ আর-রাঈ (মৃঃ ১৩৬ হিঃ)-এর মতামতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত চিন্তাধারা মদীনার মানুষের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য ছিল। এর কারণ ছিল ইমাম মালিক (রাঃ) উপরোক্ত সাহাবী ও তাবেঈগণের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে তাঁর আইন বিষয়ক যুক্তিসমূহ উপস্থাপন করেছিলেন।

অনুরূপভাবে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং তাঁর অনুসারীগণের আইন বিষয়ক মতামত, খলিফা হযরত আলী (রাঃ), শুরায়হ (মৃঃ ৭৭ হিঃ) এবং আশ-শা'বী (রঃ) (মৃঃ ১০৪ হিঃ) প্রদত্ত রায়সমূহ এবং ইবরাহীম নাখঈ (মৃঃ ৯৬ হিঃ)-এর ফতোয়া কুফার জনগণের নিকট বেশি গ্রহণযোগ্য ছিল।

এরূপ অবস্থা প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রঃ) লিখেছেন :

"মৃতের ভাইগণ ও পিতামহের মধ্যে উত্তরাধিকার বন্টনের ক্ষেত্রে মাসরুক (রঃ) (মৃঃ ৩৬ হিঃ) যখন যায়দ ইবনে ছাবিতের মতামত অনুসরণ করলেন তখন আলকামা (মৃঃ ৬২ হিঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ

কি আছেন যিনি আব্দুল্লাহর (ইবনে মাসউদ) চাইতে বেশি জ্ঞানী? মাসরুক (রঃ) উত্তর দিলেন, "না, তবে যায়দ ইবনে ছাবিত (রঃ) এবং মদীনার লোকেরা মৃতের ভাইগণ ও পিতামহের মধ্যে উত্তরাধিকার বন্টন করে থাকে... ।"

সুতরাং যদি কোন বিষয়ে মদীনার লোকেরা একমত হতেন তখন তাবেঈর অনুসারী সে যুগের আলিমগণ তা অটলভাবে অনুসরণ করতেন। তাই ইমাম মালিক (রঃ) যখন বলেন, 'আমরা মদীনার লোকেরা সুন্নাহর যে সকল বিষয়ে মতভেদ করিনি সেগুলো হচ্ছে', ...তা এ অর্থেই বলেছেন। মদীনায় প্রাথমিক যুগের ফিকাহবিদগণ কোন বিষয়ে মত পার্থক্য করে থাকলে পরবর্তী যুগের ফিকাহবিদগণ সেগুলোর মধ্যে প্রাথমিক যুগের বেশি সংখ্যক ফিকাহবিদ কর্তৃক অনুসৃত হওয়া অথবা তাঁদের কর্তৃক আইনসম্মত ও স্পষ্ট কোন কিয়াসের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া অথবা কুরআন ও সুন্নাহর কিছু মূল উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া ইত্যাদি কারণে যেটি বেশি সমর্থন ও নির্ভরযোগ্যতা পেয়েছে সেটিকে গ্রহণ করতেন। এ প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে ইমাম মালিক (রঃ) বলেছেন, "আমি যা শুনেছি তন্মধ্যে এটি উত্তম।" পরবর্তী যুগের ফিকাহবিদগণ যদি কোন সমস্যার ব্যাপারে তাঁদের পূর্ববর্তী আলেমগণের লেখা থেকে কোন সমাধান না পেতেন তাহলে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব আইন বিষয়ক মতামত প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ফিরে যেতেন কুরআন ও সুন্নাহর সংশ্লিষ্ট মূল উৎসে। এ যুগের গবেষকগণ তাঁদের গবেষণার বিষয়াবলী লিপিবদ্ধ করে রাখার ব্যাপারে উৎসাহিত হন। সুতরাং মদীনায় ইমাম মালিক (রঃ), মক্কায় ইবনে আবু যেব (মৃঃ ১৫৮ হিঃ), ইবনে জুরাইজ (মৃঃ ১৫০ হিঃ) এবং ইবনে উয়াইনাহ (মৃঃ) ১৯৬ হিঃ), কুফার আছ-ছাওরী (মৃঃ ১৬১ হিঃ) এবং বসরায় রাবী ইবনে সুবাইহ (মৃঃ ১৬০ হিঃ) তাঁদের গবেষণার বিষয়াবলী লিপিবদ্ধ করে রাখা শুরু করলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁরা সকলে একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন।

আব্বাসী খলিফা মানসুর হজ্জ পালন করার সময়ে ইমাম মালিক (রঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং বললেন, আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে, আপনার লেখা কিতাবগুলোর কপি প্রস্তুত করার আদেশ দেব। এরপর আমি এগুলোর একখানা করে কপি মুসলিম দুনিয়ার সকল অঞ্চলে প্রেরণ করে আলেমগণকে নির্দেশ দেব যেন তাঁরা এগুলো অনুসারে কাজ করেন এবং অন্য কোন কিতাবের অনুসরণ না করেন।

ইমাম মালিক (রঃ) বললেন, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! ঐ কাজ করবেন না। ইতোমধ্যে লোকেরা বিভিন্ন ধরনের আইন বিষয়ক মতামত শুনেছে, হাদীস এবং বিভিন্ন বিবরণ শুনেছে। তাঁদের কাছে প্রথম যা পৌছেছে তাই তাঁরা গ্রহণ করেছে। ফলে এগুলো লোকদের মধ্যে প্রচলিত আমলসমূহের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টিতে অবদান রেখেছে। প্রত্যেক নগরীর লোকেরা তাদের অনুসরণের জন্য যা ইতোমধ্যে বেছে নিয়েছে তা তাঁদের উপর ছেড়ে দিন।'

একই ঘটনা খলিফা হারুনুর রশিদ প্রসঙ্গেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি মুয়াত্তার অনুসরণ করা লোকদের জন্য বাধ্যতামূলক করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইমাম মালিক (রঃ) বলেছিলেন, ঐ কাজ করবেন না। কেননা রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সাহাবীগণ সুন্নাহর ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। সুতরাং তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন পথ এখন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

ইমাম মালিক (রঃ) মদীনার লোকদের দ্বারা বর্ণিত রাসূলুল্লাহর (সাঃ) হাদীসের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বেশি অবহিত ছিলেন এবং ইমাম মালিকের (রাঃ) বর্ণনাকারীগণের ধারাবাহিকতা সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য। তিনি হযরত উমর (রাঃ) প্রদত্ত রায়সমূহ এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) এবং আয়েশা (রাঃ) ও তাঁদের অনুসারীগণের মধ্যে সাতজন ফিকাহবিদের আইন বিষয়ক বক্তব্যসমূহ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বেশি অবহিত ছিলেন। হাদীসের বর্ণনা ও ফতোয়া সংক্রান্ত বিজ্ঞান মূলত ইমাম মালিক (রঃ) এবং তাঁর মতো অন্যান্য গবেষকগণের জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) মূলতঃ ইবরাহীম নাখঈ (রঃ) ও তাঁর সহকর্মীগণ প্রদত্ত আইন বিষয়ক ব্যাখ্যার প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং খুব কদাচিৎ তাঁদের যুক্তি বহির্ভূত যুক্তি প্রদান করেছেন। ইবরাহীমের (রঃ) পদ্ধতি অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত প্রণয়নের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনন্য। তিনি নজীরি আইনে পুঙ্খানুপঙ্খ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও উল্লেখিত পদ্ধতি হুবহু প্রয়োগ করতেন।

আমরা যা বলেছি সে ব্যাপারে যদি আপনি সত্যতা যাচাই করতে চান তাহলে ইবরাহীম (রঃ) এবং তাঁর অনুসারীগণের শিক্ষার সারসংক্ষেপ প্রণয়ন করুন। নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহে উল্লেখিত সারসংক্ষেপ আপনি দেখতে পারেন :

মুহাম্মদ আশ-শায়বানী রচিত কিতাবুল আছার, আবদুর রাজ্জাক রচিত জামী এবং ইবনে আবু শায়বাহ রচিত মুসান্নাফ (সংকলন)। এরপর ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর ব্যবহারিক বিষয়ে মতামতসমূহকে এর সাথে তুলনা করুন।

তাহলে আপনি অবশ্যই দেখতে পাবেন যে, আবু হানিফা (র:) কদাচিত তাঁদের অনুসৃত পদ্ধতি থেকে দূরে সরেছেন এবং এমনকি দেখা যাবে যে, তাঁর মতামত এবং কুফার বিচারকগণের মতামতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।[৭]

প্রকৃতপক্ষে এখানে দেহলভীর (র:) মন্তব্যগুলোকে বিবেচনায় আনতে হবে। তিনি এ ব্যাপারে জোর দিতে আগ্রহী ছিলেন যে, ইমাম মালিক (র:) ও আবু হানিফা (র:) এবং তাঁদের অনুসারীগণ তাঁদের পূর্ববর্তী সাহাবা ও তাবেঈগণের মতামত কমবেশি অনুসরণ করেছেন (অর্থাৎ তাঁরা তাঁদের নিজস্ব ইজতিহাদকে অগ্রাধিকার দেননি) এবং তাঁদের পূর্ববর্তীগণের দেয়া আইনগত সিদ্ধান্তসমূহ অস্বীকার করেননি। অবশ্য তাঁর এ উপসংহারের সাথে একমত হওয়া কঠিন।

এটা সকলেই জানেন যে, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে ফিকাহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা হয়। প্রত্যেক ইমাম এ শাস্ত্র অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করেছেন। সুতরাং এটা দাবি করা খুব সহজ ব্যাপার নয় যে, এ সকল ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সাহাবা এবং তাবেঈগণের কাছ থেকে নেয়া হয়েছে। যেমন মালিক (র:) আইনের উৎস (পরোক্ষ) হিসেবে মদীনার জনসাধারণ কর্তৃক অনুসৃত প্রথা ও আচরণসমূহকে গ্রহণ করেছেন এবং আবু হানিফা (র:) আল-ইসতিহসান এবং আল-উরফ পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন।[৮]

উপরন্তু তাঁরা দু'জনেই তাবেঈগণের প্রদত্ত ফতোয়ার উপর ভিত্তি করে তাঁদের যুক্তিসমূহ দাঁড় করাননি, বরং তাঁদের সম্পর্কে মন্তব্য করেন এই বলে যে, "তাঁরা মানুষ ছিলেন (জ্ঞানের ক্ষেত্রে) এবং আমরাও মানুষ। এ ছাড়া তাঁরা তাঁদের পূর্ববর্তীগণের সাথে এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলেন যে, হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণের ক্ষেত্রে তাঁরা প্রত্যেকেই নিজস্ব কিছু শর্তাবলী নির্ধারণ করেছিলেন। অধিকন্তু পূর্বে কখনো প্রচার হয়নি এরূপ হাদীস এবং মশহুর হাদীসের মর্যাদা ও এগুলোর ভিত্তিতে আইনগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁরা সাহাবীগণের সাথে মতপার্থক্য করেছেন।

---

৭. দেহলভী, পূর্বোক্ত, ১খ., ২০৫-৩০৮ থেকে ইচ্ছামতো সংক্ষিপ্তকরণ করা হয়েছে।
৮. এখানে গ্রন্থকার বলতে চেয়েছেন যে, এ সকল পদ্ধতিগত হাতিয়ার সাহাবীগণের নিকট অজ্ঞাত ছিল, তথাপি উক্ত দু'জন ইমাম এগুলোকে প্রয়োগ ও ব্যবহার করেছেন।

যুক্তিবাদী এবং ঐতিহ্যবাদী আহ্‌লুল-হাদীস এবং আহ্‌লুর-রায় :

যুক্তিবাদী বা আহলে রায় এবং ঐতিহ্যবাদী বা আহলে হাদীস এ দুটি ব্যতিক্রমধর্মী আইন বিষয়ক চিন্তাগোষ্ঠী সম্পর্কে বলতে গেলে সম্ভবত এ সত্যটি অধিকতর অর্থবহ হবে যদি আমরা আইনের কোন মূলনীতি ও নজীরি আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে যে মতপার্থক্যের সূচনা হয়েছিল, সেদিকে দৃষ্টিপাত করি। যদিও এটা সত্য যে, উভয় চিন্তাগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্যের গোড়াপত্তন হয়েছিল তাঁদের দু'পুরুষ আগে, কিন্তু আলোচ্য সময়ে ফিকাহ বিষয়ে তাঁদের মতপার্থক্য আরো স্পষ্ট হয়েছিল। এই সময় থেকে লোকেরা তাদের মতবিরোধের ভিত্তিতে আইনের উৎসসমূহ থেকে সমাধান বের করতে গিয়ে বিভিন্ন মাযহাবে দলবদ্ধ হতে শুরু করে।

ইসলামী আইনের ইতিহাস লেখকগণ গুরুত্বারোপ করেন যে, আহলে রায়-এর যুক্তিবাদী চিন্তাধারা মূলতঃ উমর (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর চিন্তাধারার সম্প্রসারিত রূপ। সাহাবীগণের মধ্যে এঁরা রায় (মতামত) পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছিলেন। পরবর্তীকালে ইবরাহীম নাখঈ (রঃ)-এর শিক্ষক এবং চাচা আলকামাহ নাখঈ (মৃঃ ৬০ অথবা ৭০ হিজরী) তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হন। ইবরাহীম (রঃ), হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমানকে (মৃঃ ১২০ হিঃ) শিক্ষা দান করেন এবং যিনি পরবর্তী কালে আবু হানিফার (রঃ) শিক্ষক হন।

ঐ ঐতিহাসিকগণ জোর দিয়ে বলেন যে, আহলে হাদীসের ঐতিহ্যবাদী চিন্তাধারা হচ্ছে সে সকল সাহাবীর অবিচ্ছিন্ন চিন্তাধারা, যাঁরা হাদীসের মূল বাণীর (নুসূস) সাথে বিরোধ সৃষ্টির ভয়ে সাবধানতাবশতঃ মূলবাণী থেকে একটুও সরে যেতেন না। ব্যাপক অর্থে আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর ইবনুল খাত্তাব, আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস, যুবায়ের এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস এ মতের অনুসারী ছিলেন।

বিভিন্ন কারণে আহলে হাদীসের চিন্তাধারা হিজাযে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। এর মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কারণ সম্ভবত এই যে, এ অঞ্চলে লোকদের বিপুল সংখ্যক হাদীস এবং অন্যান্য বিবরণ জানা ছিল এবং বস্তুত খিলাফতের কেন্দ্র স্থানান্তরিত হওয়ার পর এ অঞ্চলটি অধিকতর স্থিতিশীল ছিল। বেশির

ভাগ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রথমে দামেস্কে এবং পরে বাগদাদে স্থানান্তরিত হয়। মদীনার ইমাম সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (মৃঃ ৯৪ হিঃ) এক সময় মন্তব্য করেছিলেন যে, মক্কা ও মদীনার লোকেরা হাদীস এবং ফিকাহ খুব বেশি বিস্মৃত হয়নি। কারণ তাঁরা আবু বকর (রাঃ), উমর (রাঃ), উসমান (রাঃ), আলী (রাঃ) (খলিফা হওয়ার পূর্বে), আয়েশা (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইবনে উমর (রাঃ), যায়দ ইবনে ছাবিত (রাঃ) এবং আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখের ফতোয়া ও বিবরণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। সুতরাং আইন প্রণয়নের জন্য তাঁদেরকে রায়-এর অনুসরণ করতে হয়নি।

অপরদিকে আহলে রায়-এর চিন্তাধারা ইরাকে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ দলের আলেমগণ চিন্তা করেছিলেন যে, শরীয়াহর আইনগত ব্যাখ্যাকে অবশ্যই যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। জনগণের সর্বোত্তম কল্যাণ বিবেচনায় আনতে হবে এবং অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য প্রজ্ঞা দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। বস্তুত এ সকল চিন্তাবিদ উল্লিখিত তাৎপর্য, আইনের অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা এবং এগুলোর পারম্পর্য তুলে ধরাকে তাঁদের কর্তব্য মনে করেছিলেন। যে বিশেষ প্রয়োজনে আইন জারি করা হয়েছিল, যদি সময়ের আবর্তন ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে সে আইনের উপযোগিতা নষ্ট হয়ে যায়, তখন তা আর কোনক্রমেই বৈধ থাকতে পারে না। আর যদি কোন বৈধ থাকার সমর্থনে যুক্তি আছে বলে মনে করতেন তাহলেও তাঁরা মাঝে মাঝে সেগুলোর সমর্থনে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে যুক্তিসমূহ পেশ করতেন। এভাবে তাঁরা যুক্তি এবং কোন বিশেষ ধরনের হাদীসের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে অনেক ক্ষেত্রে যুক্তিকে আইনগত অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন।

উমর (রাঃ)-এর অনুসৃত পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বেশ কিছু সংখ্যক সাহাবীর সহায়তায় ইরাকে এ পদ্ধতি বিস্তৃতি লাভ করে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইবনে মাসউদ (রাঃ), আবু মুসা আল-আশয়ারী (রাঃ), ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ), আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) এবং ইবনে আব্বাস (রঃ)-সহ আরো অনেকে। খেলাফতের কেন্দ্র ইরাকে স্থানান্তরিত হওয়া এবং আলী (রাঃ) ও তাঁর সমর্থকগণের সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার ফলে এ পদ্ধতির আরো প্রসার ঘটে।

ইরাকে শিয়া ও খারিজীদের মত সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের ফলে প্রবল বিরোধের সূচনা হয় এবং ভুয়া হাদীস রচনা করাও এ সময় ব্যাপকতা লাভ করে।[৯] ফলে হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা নিরূপণের জন্য ইরাকের আইনবিদগণ বিভিন্ন শর্ত আরোপে বাধ্য হন। উক্ত শর্তানুসারে ইরাকে বসবাসকারী সাহাবীগণের দেয়া স্বল্পসংখ্যক বিবরণ হাদীস হিসেবে গৃহীত হয়। কিন্তু ব্যাপক সংখ্যক আইনগত সমস্যা, বিশেষত উক্ত অঞ্চলে নজীরবিহীনভাবে বিভিন্ন আইনগত সমস্যার ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে শুধুমাত্র এ সকল নির্ভরযোগ্য হাদীসের দ্বারা সমাধা করা যাচ্ছিল না।

সুতরাং এর ফলে উম্মাহর মধ্যে যারা শিয়া অথবা খারিজীদের দলে অন্তর্ভুক্ত না থেকে আহলে হাদীস বা আহলে রায় এ দুটি দলে বিভক্ত ছিলেন, তাদের মধ্যকার বিরোধ আরো ঘণীভূত হয়।

আহলে রায়ের সমর্থকগণ আহলে হাদীসের সমর্থকগণকে এই বলে সমালোচনা করতেন যে, তাঁরা স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন এবং ফিকাহ শাস্ত্র বুঝার ক্ষমতাও তাঁদের নিতান্তই কম। অপরদিকে আহলে হাদীসেরা দাবি করতেন যে, আহলে রায়-এর মতামতসমূহ মূলতঃ আন্দাজ-অনুমানের বেশি কিছু নয় এবং তারা ধর্মীয় গুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় সতর্কতা অবলম্বন থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখেছে। অথচ তা কেবল ধর্মের মূল উৎসের উপর নির্ভর করেই নিশ্চিত করা সম্ভব।

বস্তুতঃ আহলে রায় সকল মুসলমানের সাথে এ ব্যাপারে একমত পোষণ করে যে, যখন কোন ব্যক্তি সুন্নাহকে সুস্পষ্টরূপে অনুধাবন করতে সক্ষম হয় তখন সে কোন ব্যক্তিবিশেষের মতামতের সমর্থনে সুন্নাহকে অস্বীকার করতে পারে না। তবে যে সকল বিষয়ে তাদেরকে সুন্নাহ বিরোধী বলে সমালোচনা করা হয়েছে সে সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য এই যে, তারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন হাদীস ছিল বলে জানতেন না বা এমন কোন একটি হাদীস সম্পর্কে জানতেন যাতে তাঁরা বর্ণনাকারীগণের কোন দুর্বলতা বা অন্য কোন ক্রটি (এমন কোন ক্রটি যাকে অন্যরা ক্ষতিকারক মনে করেননি) দেখতে পেয়েছেন। তাই তাঁরা ঐ হাদীসকে

---

৯. এই উপদল অপর দলকে তাদের কাজে প্রবলভাবে বাধা দিত। তারা ইসলামের মূল ধারা থেকে সমর্থন সংগ্রহে তৎপর হয়। তারা রাসূলের (সাঃ) হাদীসে ব্যবহৃত শব্দসমূহের বিকৃত অর্থ করতো এবং তাদের নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে কিছু মনগড়া শব্দ ও ব্যাখ্যা রাসূলের (সাঃ) হাদীস বলে চালিয়ে দিত। (সম্পাদক)

নিখুঁত হিসেবে বিবেচনা করেননি অথবা তাঁরা একই বিষয়ে অন্য কোন নিখুঁত হাদীস জানতেন যা থেকে গৃহীত আইনগত তাৎপর্য অন্যান্যদের সাথে বিরোধ সৃষ্টি করেছে।

আহলে হাদীসগণ অবশ্য এ ব্যাপারে আহলে রায়ের সাথে একমত পোষণ করেন যে, মূল উৎস তথা কুরআন ও হাদীসের সরাসরি কোন নির্দেশ পাওয়া না গেলে যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। উল্লেখিত মতৈক্য থাকা সত্ত্বেও উভয় দলের মধ্যে বিরোধ ও উত্তেজনা প্রকট আকারে বিরাজমান থাকে।

৪র্থ অধ্যায়

ইমাম শাফেঈ (রঃ)

ইমাম শাফেঈ (রঃ) ১৫০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। একই বছর ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ইন্তেকাল করেন। তিনি প্রথম মক্কায় আহলে হাদীসের কতিপয় চিন্তাবিদের, যেমন মুসলিম ইবনে খালিদ আল-যিনজী (মৃঃ ১৭৯ হিঃ) এবং সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ (মৃঃ ১৯৮ হিঃ) নিকট ফিকাহ্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি মদীনার ইমাম ও আহলে হাদীসের নেতা মালিক ইবনে আনাস (রাঃ)-এর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁর সংগৃহীত হাদীস ও আইন বিষয়ক মতামতের উপর ভিত্তি করে রচিত গ্রন্থ মুয়াত্তা মুখস্থ করেন। বস্তুত ইমাম শাফেঈ (রঃ) নিজেকে সবসময় ইমাম মালিক (রঃ)-এর কাছে ঋণী মনে করতেন। কথিত আছে যে, ইউনুস ইবনে আবদুল আলা (রঃ) ইমাম শাফেঈ (রঃ)-কে বলতে শুনেছেন : "যখনই আলেমগণের কথা বলা হয়ে থাকে তখন (তাদের কর্ম ও জ্ঞানের তুলনাকালে) মালিক (রঃ)-এর কথা সকলের চাইতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আমি মালিক ইবনে আনাস (রঃ)-এর অপেক্ষা আর কোন ব্যক্তির নিকট এতো বেশি উপকৃত হইনি।"[১] ইমাম শাফেঈ (রঃ) ভাষা, কবিতা, সাহিত্য, ইতিহাস এবং কিছু প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও অংক শাস্ত্র সম্পর্কে অধ্যয়নের পর উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলেন।

ইমাম শাফেঈ (রঃ) আহলে হাদীস সম্পর্কিত যে সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন তার সবগুলো দ্বারা প্রভাবিত হননি। যেমন তিনি মুনকাতি[২] হাদীস গ্রহণ করায় আহলে হাদীসের সমালোচনা করে বলেন, "মুনকাতি আসলে কিছুই না।"

---

১. ইবনে আবদুল বার, আল-ইনতিকা, পৃঃ ২৩।

২. যে হাদীসের বর্ণনাকারীগণের ধারাবাহিকতায় কোন না কোন পর্যায়ে বিচ্ছিন্নতা এসেছে। ফলে হাদীসখানিকে প্রাথমিক যুগের বর্ণনা তথা রাসূল (সাঃ)-এর হাদীস হিসেবে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা সম্ভব নাও হতে পারে। এ ধরনের হাদীস পরবর্তীকালের সকল ফিকাহবিদ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছে। (সম্পাদক)

ইমাম শাফেঈ (রঃ) তাঁদের মুরাসল[৩] শ্রেণীর হাদীস গ্রহণ করায় (যদিও তিনি নিজে সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব বর্ণিত মুরসাল হাদীস গ্রহণ করে ব্যতিক্রম সৃষ্টি করেছেন) এবং বর্ণনাকারীর (যে সকল হাদীস তাঁরা নির্ভরযোগ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন) গ্রহণযোগ্যতার শর্তাবলীর বিষয়ে অতিরিক্ত কড়াকড়ি আরোপ করার জন্য সমালোচনা করেছেন।

ইমাম শাফেঈ (রঃ) আহলে রায়-এর শক্তিশালী কেন্দ্র ইরাকে গিয়ে লক্ষ্য করলেন যে, তাঁরা মদীনার লোকদের আইন বিষয়ক মতামত ও পদ্ধতির বিভিন্ন ত্রুটি, বিশেষ করে তাঁর উস্তাদ ইমাম মালিক (রঃ)-এর ত্রুটি খুঁজে বের করার ব্যাপারে অতিরিক্ত আগ্রহী। তাই ইমাম শাফেঈ (রঃ) তাঁর উস্তাদের চিন্তাধা রা ও পদ্ধতির সমর্থনে বক্তব্য রাখলেন। বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি বলেছিলেন : "মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আমাকে বলেছিলেন, আমাদের উস্তাদ (অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা) তোমাদের উস্তাদ অপেক্ষা বেশি জ্ঞানী ছিলেন। তোমাদের উস্ত াদের কথা বলা উচিত ছিল না। আর আমাদের উস্তাদ চুপ থেকে ভুল করেছেন।"

এ কথায় আমার খুব রাগ হলো এবং আমি তাকে বললাম, "আল্লাহর শপথ করে বলুন, মালিক (রঃ) এবং আবু হানিফা (রঃ) এ দু'জনের মধ্যে কার রাসূলের (সাঃ) সুন্নাহ সম্পর্কে বেশি জ্ঞান ছিল?" তিনি বললেন, "মালিক (রঃ), তবে আমাদের উস্তাদ কিয়াসে (বুদ্ধিবৃত্তিক সমাধানে) অধিক পারদর্শী ছিলেন।"

আমি উত্তরে বললাম, "হ্যাঁ, তবে মালিক (রঃ) কুরআন, কুরআনের নাসিখ-মানসূখ (রহিতকারী ও রহিতকৃত আয়াত) সম্পর্কে এবং রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সুন্নাহ সম্পর্কে আবু হানিফা (রঃ) অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী ছিলেন। কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে যার জ্ঞান বেশি তাঁরই বলার হক আছে।"[৪]

ইমাম শাফেঈ (রঃ) মুহাম্মদ ইবনুল হাসান এবং ইরাকের অন্যান্য চিন্ত াবিদগণের[৫] লিখিত পুস্তকাদি অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি মুহাম্মদ ইবনুল

৩. মুরসাল হাদীস কাকে বলে এবং মুরসাল হাদীসকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিতর্ক সম্পর্কে ৩য় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৪. ইবনে আবদুল বার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪।

৫. এখানে উল্লেখ্য যে, মুহাম্মাদ ইবনে হাসান ও ইমাম মালিক (রঃ)-এর নিকট অধ্যয়ন করেছিলেন এবং অনেকের মতে তাঁর সংকলিত ইমাম মালিকের (রঃ) মুয়াত্তা বেশি নির্ভরযোগ্য। ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) রচিত "কিতাবুর রাদ আলা আহলিল মাদীনা" গ্রন্থটিতে

হাসান (রঃ)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর মতামত সম্পর্কে আলোচনা করেন, যদিও তিনি সবসময় সুন্নাহ ও আহলে হাদীসের মত সমর্থন করে গেছেন।

ইমাম শাফেঈ (রঃ) কিছুকালের জন্য বাগদাদ ত্যাগ করেন। পরে ১৯৫ হিজরী সনে যখন পুনরায় বাগদাদে ফিরে আসেন তখন বাগদাদের বড় মসজিদে নিয়মিতভাবে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি পাঠচক্র বসতো। ইমাম শাফেঈ (রঃ) এক এক করে সবকটি পাঠচক্রে গিয়ে "আল্লাহ এবং রাসূলের (সাঃ) কথা" বর্ণনা করতেন, যদিও তখন অন্যান্য উস্তাদগণ বলতেন কেবল তাঁদের উস্তাদের কথা। ফলে কালক্রমে মসজিদে ইমাম শাফেঈ (রঃ)-এর পাঠচক্রটি ছাড়া আর কোন পাঠচক্র রইল না।

আবু ছাওর, আল-জা'ফারানী ও আল-কারাবীসীসহ আহলে রায়ের আরো অন্যান্য মহান চিন্তাবিদগণ ইমাম শাফেঈর (রঃ) পাঠচক্রে হাজির হতেন। এ সময় অনেকে আহলে রায়ের মত পরিত্যাগ করে ইমাম শাফেঈ (রঃ)-কে অনুসরণ করতে শুরু করলেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এ পাঠচক্রে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছিলেন, "কালির দোয়াত বহনকারী যে কোন হাদীস বর্ণনাকারী কোন না কোনভাবে ইমাম শাফেঈ (রঃ) থেকে উপকৃত হয়েছেন।"

ইমাম আহমদকে (রঃ) বিষয়টি জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আহলে রায়ের লোকেরা আহলে হাদীসের লোকদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা। করতো ইমাম শাফেঈর (রঃ) শিক্ষা ও যুক্তি দ্বারা এই প্রবণতা প্রতিহত করা হয়।[৬]

এছাড়া আহলে হাদীসের সমর্থকগণের অনুরোধের প্রেক্ষিতে বাগদাদে আহলে রায় কর্তৃক তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত যুক্তিসমূহ খণ্ডন করে ইমাম শাফেঈ (রঃ) তাঁর আল-হুজ্জাত (যুক্তিমালা) গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন।[৭]

এরপর ইমাম শাফেঈ (রঃ) মিসরে গমন করেন। সেখানে তিনি দেখতে পান যে, লোকেরা অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে এবং কোনরূপ যাচাই-বাছাই না করে মালিক

মালিকী ও হানাফী চিন্তাধারার পদ্ধতিগত পার্থক্য, বিশেষত আহলে রায় এবং সাধারণভাবে আহলে হাদীসের পার্থক্য নির্দেশনার ক্ষেত্রে এক অপূর্ব বাঙময় প্রকাশ ঘটেছে। (সম্পাদক)

৬. ইবনে আবদুল বার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৬।

৭. ইবনে আবদুল বার, প্রাগুক্ত।

(রঃ)-এর মতামত অনুসরণ করে থাকেন। এ প্রেক্ষিতে ইমাম শাফেঈ (রঃ) মালিক (রঃ)-এর আইন বিষয়ক মতামতসমূহের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করতে শুরু করলেন এবং তিনি দেখলেন যে, "...মালিক (রঃ) ঘটনাবিশেষকে গুরুত্ব না দিয়ে সাধারণ নীতিমালার ভিত্তিতে তাঁর মতামত প্রণয়ন করেছেন, আবার অন্য সময়ে সাধারণ নীতিমালাকে গুরুত্ব না দিয়ে ঘটনা বিশেষের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন।"

ইমাম শাফেঈ (রঃ) আরো লক্ষ্য করলেন যে, মালিক (রঃ) কোন একজন সাহাবী বা তাবেঈ প্রদত্ত বিবরণের উপর ভিত্তি করে কিংবা তাঁর নিজস্ব যুক্তিকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে গিয়ে অন্য আরেকটি নিখুঁত হাদীসকে অগ্রাহ্য করেছেন। ইমাম শাফেঈ (রঃ) আবিষ্কার করলেন যে, মালিক (রঃ) কোন একজন তাবেঈ প্রদত্ত বিবরণের কিংবা তাঁর ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে কোন একজন সাহাবীর বিবরণকে অগ্রাহ্য করেছেন এবং তিনি তা করেছেন পৃথক পৃথক ঘটনা হিসেবে। আইনের ব্যাপকতা বিশ্লেষণ এবং কোন সাধারণ নীতিমালার আওতায় তা করতেন না। এছাড়া মালিক (রঃ) কোন কোন ঘটনার ব্যাপারে ইজমার দাবি করলেও বাস্তবে দেখা গেছে যে, সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে।

ইমাম শাফেঈ (রঃ) আরো লক্ষ্য করলেন যে, মালিক (রঃ)-এর মতামত অর্থাৎ মদীনার লোকদের ইজমা তেমন জোরালো কিছু নয়, এগুলোকে বরং সাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। তিনি 'আল-ইখতিলাফ মাআ মালিক' (মালিক-এর সাথে মতভেদ) শিরোনামে রচিত তাঁর একখানা গ্রন্থে উপরোল্লিখিত সকল বিষয়ে আলোচনা করেন।[৮]

ইমাম শাফেঈর (রঃ) মতে ইমাম মালিক (রঃ) পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ মজুত থাকা সত্ত্বেও তাঁর নিজস্ব নীতি "মাসালিহ মুরসালাহ" (বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থ) প্রয়োগ করতে গিয়ে যথাযথ সীমা অতিক্রম করেছেন। আবু হানিফা (রঃ) সম্পর্কে তাঁর মত এই যে, অনেক ক্ষেত্রে তিনি ছোটখাট বিষয় ও বিশেষ কোন বিষয়ের ব্যাপারে তাঁর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছেন, সেগুলোর বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন কিন্তু মূলনীতির প্রতি গুরুত্ব দেননি।[৯]

---

৮. দেখুন ফখরুদ্দীন আল-রাজী, মানাকিব আল-শাফেঈ, পৃঃ ২৬।
৯. ইমামুল হারামাইন, আবদুল মালিক জুয়ায়নী মুগহীছ আল-খালক।

উল্লেখিত বিষয়গুলো মনে রেখে ইমাম শাফেঈ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দিতে হবে আইন প্রণয়নের নীতিমালার সংগ্রহ, সেগুলোর প্রয়োগের জন্য বুনিয়াদী নিয়ম-নীতি সুসংবদ্ধকরণ ও উসূলে ফিকাহ-এর বিকাশ ঘটানোর প্রতি, যাতে এগুলোর সাহায্যে যথার্থ সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বিভিন্ন ফিকাহ-সম্পর্কিত প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। ফিকাহকে হতে হবে উসূলে ফিকাহ্র বাস্তব প্রতিফলন যা আহলে রায় ও আহলে হাদীস এই দুটি চিন্তাধারার বিকল্প হিসেবে নতুন ফিকাহ শাস্ত্রের আবির্ভাব ঘটাবে।

এ উদ্দেশ্যেই ইমাম শাফেঈ (রাঃ) আল-রিসালাহ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং এ গ্রন্থে তিনি কয়েকটি নীতিমালার ভিত্তিতে তাঁর ফিকাহ শাস্ত্র ও তাঁর মাযহাব গড়ে তোলেন।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, ইমাম শাফেঈ (রাঃ)-এর আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত আমরা সাধারণ এবং বিশেষ (আল-উমুম ওয়াল-খুসূস) এ দুটি রূপের চিন্তা করতে পারিনি।[১০]

ইমাম শাফেঈ (রঃ) প্রায়ই ইমাম আহমদ (রঃ)-কে বলতেন, হাদীস ও হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সম্পর্কে আমার অপেক্ষা আপনার জ্ঞান বেশি। সুতরাং কোন প্রামাণ্য হাদীস পেলে আমাকে বলবেন। যদি তা প্রামাণ্য হয়, কুফা, বসরা, দামেস্কের (ঐ অঞ্চলসমূহের বর্ণনাকারী হতে) হলেও আমি তা গ্রহণ করব।[১১] এ বিবরণ থেকে স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, ইমাম শাফেঈ (রঃ) ছোটখাট বিষয় এবং বিশদ বিশ্লেষণ অপেক্ষা নীতিমালা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী ছিলেন। উসূলে ফিকাহ-এর ইতিহাস প্রণেতাগণ সকলে একবাক্যে স্বীকার করেন যে, এ বিষয়ের প্রথম লেখক ছিলেন ইমাম শাফেঈ (রঃ) এবং এ বিষয়ে সর্বপ্রথম লিখিত গ্রন্থ হলো তাঁর আর-রিসালাহ।[১২]

আয-যারকাশী (মৃঃ ৭৯৪ হিঃ) তাঁর রচিত আল-বাহরুল-মুহীত গ্রন্থে এ বিষয়ে একটি অধ্যায় রচনা করেছন সেখানে তিনি বলেছেনঃ

---

১০. আর-যারকানী, আল-বাহর আল-মুহিত, MS।

১১. ইবনে আবদুল বার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫।

১২. এ বিষয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে, প্রাথমিক যুগের আইন বিষয়ক চিন্তাধারাসমূহের কতিপয় অনুসারী যাঁরা তাঁদের দাবির সমর্থনে কিছু দুর্বল সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে বলেন যে, ইমাম শাফেঈর (রঃ) পূর্বে ঈমাম আবু ইউসুফের মত হানাফী চিন্তাবিদগণ শরীয়াহ বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। (সম্পাদক)

"ইমাম শাফেঈ (রঃ) ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি উসূলে ফিকাহ সম্পর্কে লিখেছেন। তিনি নিম্নবর্ণিত গ্রন্থসমূহ রচনা করেছেনঃ (১) রিসালাহ, (২) আহকামুল কুরআন (আল কুরআনের আইনগত ব্যাখ্যা), (৩) ইখতিলাফুল হাদীস (পরস্পর বিরোধী হাদীস) (৪) ইবতালুল ইসতিহ্সান (আইনগত অগ্রাধিকারের অবৈধতা), (৫) জিমাউল ইলম (সুসমন্বিত জ্ঞান) এবং (৬) আল-কিয়াস (সাদৃশ্যমূলক যুক্তিবাদ)। এ শেষোক্ত গ্রন্থে তিনি মুতাযিলাপন্থীদের ত্রুটিসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ সম্পর্কে তাঁর মত প্রত্যাহার করেন। অতঃপর অন্যান্য চিন্তাবিদগণ উসূল সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনায় তাঁকে অনুসরণ করেন।

রিসালাহ সম্পর্কিত ভাষ্য গ্রন্থে জুয়াইনী লিখেছেনঃ

"ইমাম শাফেঈর (রঃ) পূর্বে আর কেউ উসূল সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেননি কিংবা এ বিষয়ে তাঁর মতো এতো বেশি জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না। এটা প্রাসঙ্গিক যে, ইবনে আব্বাস (রঃ) সাধারণ বিষয় (আম) থেকে বিশেষীকরণ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করেছেন। প্রাথমিক যুগের অন্যান্য গবেষকগণ কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন ফতোয়াসমূহ থেকে ধারণা করা যায় যে, তাঁরা এ সম্পর্কিত নীতিমালাসমূহ অনুধাবন করতেন। কিন্তু তাঁদের পরে যারা এসেছেন তাঁরা উসূল সম্পর্কে কিছুই বলেননি এবং এ ব্যাপারে তাঁরা কোন অবদান রাখেননি। আমরা তাবেঈগণ ও তৎপরবর্তী যুগের লেখকগণের গ্রন্থাদি পাঠ করেছি কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউই উসূল সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেননি।[১৩]

আর-রিসালাহ গ্রন্থে ইমাম শাফেঈর অনুসৃত পদ্ধতিঃ

রাসূল (সাঃ)-এর নবুয়াত লাভকালে মানবজাতির অবস্থা বর্ণনার মাধ্যমে ইমাম শাফেঈ (রঃ) তাঁর গ্রন্থের সূচনা করেন। তিনি মানবজাতিকে দু'ভাগে ভাগ করেনঃ

১। আহলে কিতাব : কিতাবের অনুসারী বা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের অনুসারীগণ যারা তাদের কিতাবের পরিবর্তন করেছে এবং এগুলোর বিধান বিকৃত করেছে। তারা কুফরীতে লিপ্ত হয়ে আল্লাহর নাযিলকৃত সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়েছে।

---

১৩. দেখুন আবদুর রাজ্জাক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৪।

২। মুশরিক ও কাফিরগণ, যারা আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিপূজা করত। অত:পর ইমাম শাফেঈ '(র:) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তায়ালা সর্বশেষ রাসূল প্রেরণ করেন এবং তাঁর নিকট কিতাব নাযিল করে মানবজাতিকে রক্ষা করেছেন, যাতে তারা এর সাহায্যে অবিশ্বাসের অন্ধত্ব থেকে আলোর পথ খুঁজে পেতে পারে।

"সাবধান! যারা তাদের নিকট কুরআন আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে, এ অবশ্যই এক মহিমাময় গ্রন্থ। কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবে না পূর্বেও নয় পরেও নয়। এটা প্রজ্ঞাময় চির প্রশংসিত আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ।" (৪১ : ৪১-৪২)

এরপর ইমাম শাফেঈ (র:) ইসলামে কুরআনের মর্যাদা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং আল্লাহ কি কি বিষয়ে অনুমতি প্রদান করেছেন এবং কি কি বিষয়ে নিষেধ করেছেন, কিভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে হবে, যারা আল্লাহকে মান্য করে তাদের জন্য কি পুরস্কার এবং যারা অমান্য করে তাদের জন্য কি শাস্তি রাখা হয়েছে এবং তিনি কিভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে সতর্কীকরণ করেছেন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেছেন।

অত:পর ইমাম শাফেঈ (র:) বর্ণনা করেন যে, ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণকে কুরআনও এ সম্পর্কিত জ্ঞান যত বেশি সম্ভব অর্জন করতে হবে এবং তাদের নিয়ত (সংকল্প) শুদ্ধ করতে হবে যাতে তাঁরা কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করতে ও এর যথার্থ তাৎপর্য বের করতে সক্ষম হন।

রিসালাহ গ্রন্থের ভূমিকার শেষাংশে ইমাম শাফেঈ (র:) বলেছেন, আল্লাহর দীনের অনুসারীদের নিকট এমন কোন সমস্যা আসতে পারে না, যে ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর কিতাবে সত্য পথের ইঙ্গিত প্রদান করেননি। যেহেতু অতি পবিত্র ও মহান আল্লাহ বলেছেন :

الٓرٰ قف كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ○

"আলিফ লাম-রা। এ কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে মানব জাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পার অন্ধকার হতে আলোতে, তাঁর পথে যিনি পরাক্রমশালী প্রশংসিত।" (১৪ : ১)

بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ط وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ○

"প্রেরণ করেছিলাম স্পষ্ট নিদর্শন ও কিতাবসহ এবং তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য– যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে।" (১৬ : ৪৪)

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ○

"... আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করলাম।" (১৬:৮৯)

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ط مَاكُنْتَ تَدْرِيْ مَالْكِتٰبُ وَلَاالْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ط وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

"এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ। তুমি তো জানতে না কিতাব কি এবং ঈমান কি? পক্ষান্তরে আমি একে করেছি আলো যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করি। তুমি অবশ্যই প্রদর্শন করবে কেবল সরল পথ।" (৪২ : ৫২)

উক্ত গ্রন্থে আল-বায়ান[১৪] শিরোনামে একটি অধ্যায় রয়েছে, যেখানে আল-বায়ান শব্দটিকে একটি আইনগত পরিভাষা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। অত:পর

---

১৪. অধ্যাপক মজিদ খাদ্দুরী তৎকর্তৃক অনূদিত রিসালাহ-এর ভূমিকায় আল-বায়ান শব্দের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং প্রাচীন আইনবিদগণ কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞাসমূহ উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক খাদ্দুরী লিখেছেন ঃ "কেউ কেউ বলেন যে, এটা কোন নির্দিষ্ট আইন সমষ্টির নিছক একটি ঘোষণাকেই বুঝানো হয়েছে। অন্যান্যরা যুক্তি পেশ করেন যে, এটা দ্বারা শুধুমাত্র ঘোষণা করা হয় না, এ দ্বারা এমনকি স্পষ্টীকরণও হয়ে থাকে। যাইহোক শাফেঈ (রঃ) সম্ভবত আইন সমষ্টির বিষয়বস্তুর উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর যুক্তি হচ্ছে যে, কুরআনের সকল বক্তব্যই স্পষ্ট, যদিও কিছু কিছু বক্তব্য অন্যগুলো অপেক্ষা অধিকতর জোরালোভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং যারা আরবী ভাষা শব্দটির সম্পর্কে অজ্ঞ তাদের নিকট কোন কোন বক্তব্য অন্যদের তুলনায় কম স্পষ্ট।

কুরআনের যে সকল ঘোষণার আইনগত গুরুত্ব সম্বলিত ইঙ্গিত রয়েছে সেগুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রকারভেদে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। অনুরূপ পাঁচটি প্রকারভেদ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১। যে সকল আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ সুনির্দিষ্ট আইন ব্যবস্থার কথা প্রকাশ করেছেন, সেগুলোর শাব্দিক অর্থ ব্যতিরেকে অন্য কোনরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। এ প্রকারের-আল-বায়ানের ক্ষেত্রে কুরআনের নিজস্ব ব্যাখ্যা ছাড়া কোন ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।

২। কুরআনে উল্লেখিত যে সকল বিষয় বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যার সুযোগ রয়েছে এবং যেগুলোর প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে সুন্নাহর মাধ্যমে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

৩। যে সকল বিষয় স্পষ্টভাবে ফরজ ঘোষণা করা হয়েছে এবং রাসূল (সাঃ) কিভাবে, কেন, কাদের উপর, কখন সে সকল আইন প্রযোজ্য হবে অথবা হবে না তা ব্যাখ্যা করেছেন।

৪। যে বিষয় সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন কিন্তু সে ব্যাপারে কুরআনে কোন উল্লেখ নেই। আল্লাহ্ সোবহানুহু ওয়া তায়ালা কুরআনে আদেশ দিয়েছেন যে, রাসূল (সাঃ)-কে মান্য করতে হবে এবং তাঁর দেয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং রাসূল (সাঃ) নিজ এখতিয়ারে যা বলেছেন তা আল্লাহর এখতিয়ারে বলা হয়েছে।

৫। যে সম্পর্কে আল্লাহ্ চান যে, তাঁর বান্দাহগণ ইজতিহাদের মাধ্যমে অনুসন্ধান করুক, একে বলা যায় কিয়াস। ইমাম শাফেঈর (রঃ) মতে কিয়াস হচ্ছে : কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে কোন আইনগত সিদ্ধান্তে পৌঁছার পদ্ধতি।

ইমাম শাফেঈ (রঃ) এ পাঁচ প্রকারের আল-বায়ান সম্পর্কে পাঁচটি পৃথক অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন এবং প্রতি প্রকারের উদাহরণ ও সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করেছেন। রিসালাহ্ গ্রন্থে সংযোজিত পরবর্তী অধ্যায়সমূহ নিম্নরূপ :

সে অনুসারে অধ্যাপক খাদ্দুরী আল-বায়ান অনুবাদ করেছেন, "সুস্পষ্ট ঘোষণা" (Perspicuous declaration) দেখুন, খাদ্দুরী, Islamic Jurisprudence, The Johns Hopkins Press, পৃঃ ৩২-৩৩।

১. কুরআনে নাযিলকৃত সাধারণ ঘোষণাসমূহকে সাধারণ ও ব্যাপকার্থে (আম) গ্রহণ করতে হবে। তবে এগুলোর মধ্যে বিশেষ বিশেষ (খাস) বিষয়াদিও অন্তর্ভুক্ত আছে।

২. কুরআনে বাহ্যিকভাবে যে সকল সাধারণ ঘোষণা রয়েছে সেগুলোর মধ্যে সাধারণ ও বিশেষ বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত আছে।

৩. কুরআনের যে সকল ঘোষণা বাহ্যিকভাবে সাধারণ (ব্যাপকার্থক) মনে হয় ঐগুলো দ্বারা বিশেষ ঘোষণা বুঝানো হয়েছে।

৪. কুরআনে ঐ শ্রেণীর বর্ণনা যার তাৎপর্য কুরআনের আয়াতের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়।

৫. কুরআনের ঐ শ্রেণীর বর্ণনা যেগুলোতে ব্যবহৃত শব্দ বাহ্যিক অর্থ অপেক্ষা গূঢ়ার্থ বহন করে।

৬. কুরআনের সে অংশ যা ব্যাপকার্থে নাযিল হয়েছে কিন্তু সুন্নাহ দ্বারা সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এগুলো বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হবে।

উপরে বর্ণিত অধ্যায়সমূহে ইমাম শাফেঈ (রঃ) সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসেবে সুন্নাহর বৈধতা এবং দীন ইসলামে এর মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ কারণে তিনি গ্রন্থটিতে নিম্নবর্ণিত অধ্যায়সমূহ সংযোজন করেছেন।

রাসূলের (সাঃ) আনুগত্য করার জন্য (বান্দার প্রতি) আল্লাহর আদেশ এবং এই আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যের সাথে সুসম্বন্ধ।

যে সকল বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা (তাঁর বান্দাগণকে) রাসূলের (সাঃ) আনুগত্য করার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলের (সাঃ) প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন এবং আল্লাহ তাঁকে যা যা নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি সেগুলো অনুসরণ ও মান্য করতে বাধ্য ছিলেন এবং যে কেউ তাঁকে অনুসরণ করবে আল্লাহ তাকে পথনির্দেশ দান করবেন– এই বিষয়টি আল্লাহ সেভাবে পরিষ্কার করে বর্ণনা করেছেন।

এ অধ্যায় ইমাম শাফেঈ (রঃ) রাসূলের (সাঃ) সকল সুন্নাহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যেগুলোর সমর্থনে কুরআনের আয়াত বিদ্যমান ছিল এবং যে সকল সুন্নাহ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে সরাসরি সমর্থনকারী কোন প্রাসঙ্গিক আয়াত নেই।

ইমাম শাফেঈ (রঃ) আরো দেখিয়েছেন যে, এমন বিষয় সম্পর্কিত সুন্নাহর অস্তিত্বও আছে যে বিষয় সম্পর্কে কুরআন নীরব। এ ব্যাপারে তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণকারীদের যুক্তি খণ্ডন করে তিনি সাক্ষ্য-প্রমাণ উদ্ধৃত করে বলেন, "আমি সুন্নাহ সম্পর্কে ইতিপূর্বে যা যা বলেছি অর্থাৎ কোন সুন্নাহ কুরআন কর্তৃক সমর্থিত না কি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অতিরিক্ত বিধান হিসেবে বিবেচ্য হবে সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করব এবং ইনশাআল্লাহ উপরে যে বিষয়ে আমি আলোচনা করেছি সে সকল বিষয়ের বিশ্লেষণ করবো। আমি প্রথমে আল্লাহর কিতাব ভিত্তিক সুন্নাহ সম্পর্কে বলব। অবরোহ পদ্ধতিতে যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে রহিতকরণ (আল-নাসিখ) সম্পর্কিত সুন্নাহসমূহ এবং আল-কুরআনের রহিতকৃত (আল-মানসুখ) অংশসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করব। অত:পর আমি কুরআনে বর্ণিত সুনির্দিষ্ট ফরজ কর্তব্যসমূহ এবং সে সম্পর্কিত সুন্নাহসমূহ তুলে ধরব। যে সকল ফরজ কর্তব্য নাযিল হয়েছে ব্যাপকার্থে কিন্তু রাসূল (সাঃ) যেগুলো কখন কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে সে ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করে বিশেষীকরণ করেছেন; যে সকল ব্যাপকার্থবোধক আয়াতকে ব্যাপকার্থাবোধক বলে মনে হলেও বিশেষ অর্থে বুঝতে হবে এবং সবশেষে রাসূলের (সাঃ) সে সকল সুন্নাহ, যেগুলো আল্লাহর কিতাবে নাযিলকৃত কোন আয়াতের ভিত্তিতে হয়নি।"

"রহিতকারী আয়াত এবং রহিতকৃত আয়াত" শিরোনামে একটি অধ্যায় রয়েছে। উক্ত অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, শরীয়াহকে সহজতর এবং অধিকতর নমনীয় করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ সোবহানুহু তায়ালা কুরআনের কোন কোন আয়াত রহিত করেছেন। এ অধ্যায়ে আরেকটি বিষয় সুস্পষ্ট করা হয়েছে যে, শুধুমাত্র কুরআনের একটি আয়াত দ্বারা আরেকটি আয়াতকে এবং কোন একটি সুন্নাহকে অপর একটি সুন্নাহ দ্বারা রহিত করা যায়।

এরপর তিনি কুরআন ও সুন্নাহর নাসিখ ও মানসুখ-এর প্রক্রিয়া সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করেন।

অত:পর এসেছে ফরজ সালাত সম্পর্কে আলোচনা এবং কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে সালাত আদায় করার ব্যাপারে যাদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে এবং যে ধরনের অবাধ্যতামূলক কাজ করলে সালাত কবুল হবে না সে সম্পর্কিত ব্যাখ্যা। পরবর্তী পর্যায়ে ইমাম শাফেঈ (রঃ) সুন্নাহ ও ইজমা অনুসারে কুরআনের যে সকল আয়াত এবং সুন্নাহ রহিত হওয়া বা রহিত করার ইঙ্গিত পাওয়া যায় সে সম্পর্কে নিম্নরূপভাবে বর্ণনা করেছেন :

–ফরজ কর্তব্যসমূহের মধ্য হতে যেগুলো আল্লাহ তায়ালা কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

– সে সকল ফরজ কর্তব্যসমূহ, যেগুলো সম্পর্কে কুরআন এবং রাসূলের (সাঃ) সুন্নাহ পৃথক পৃথকভাবে নির্দেশ প্রদান করে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের বিষয়টি রাসূলের (সাঃ) প্রতি আনুগত্যের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

– সে সকল ফরজ কর্তব্যসমূহ, যেগুলো সম্পর্কে কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে, তবে এগুলো বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগের ব্যাপারে রাসূলের (সাঃ) সুন্নাহ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

– সাধারণভাবে সে সকল ফরজ কর্তব্যসমূহ যেগুলোকে স্পষ্টভাবে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং কিভাবে সেগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে সে ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যেমনঃ সালাত, হজ্জ, যাকাত, স্ত্রীদের সংখ্যা, যে স্ত্রীলোকদেরকে বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়নি এবং খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞাসমূহ।

পরবর্তী অধ্যায়ে তিনি হাদীসের বিভিন্ন ক্রটি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে, কিছু কিছু হাদীসের মধ্যে পরস্পর বিরোধের অনেকগুলো কারণ চিহ্নিত করা যায়। তিনি তন্মধ্যে কিছু সংখ্যক কারণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ কোন একটি হাদীস আরেকটি হাদীস দ্বারা রহিত হওয়ার কারণে অথবা সংশ্লিষ্ট হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ভুলের কারণে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। কি ধরনের ভুলের কারণে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে এবং মতবিরোধের অন্যান্য অনেক কারণ সম্পর্কে তিনি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এরপর তিনি বিভিন্ন প্রকারের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করে দেখান যে, কিছু কিছু হাদীস আছে যেগুলো অন্য হাদীসের ব্যাখ্যা প্রদান করে।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) আলোচ্য গ্রন্থে জ্ঞান সম্পর্কিত একটি অধ্যায় সংযোজন করেন। তিনি বলেন, দু'প্রকারের জ্ঞান আছে। প্রথম প্রকারের জ্ঞান হলো সাধারণ জ্ঞান। যে কোন বিবেকবান পরিণত ও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ এ জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকে। এ ধরনের সকল জ্ঞান সম্পর্কে কুরআনে উল্লেখ পাওয়া যায়। সকল মুসলমান এ প্রকারের জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত। কেননা রাসূল (সাঃ)-এর মাধ্যমে পরবর্তী সকল লোকদের নিকট এ জ্ঞান পৌছেছে। এগুলো যে প্রামাণ্য জ্ঞান এ সম্পর্কে কারো দ্বিমত নেই এবং সকলেই একমত যে, এগুলো বাধ্যতামূলক। বস্তুত এ সকল জ্ঞানের প্রকৃতি এমন যে, এগুলো একজনের

নিকট থেকে আরেক জনের নিকট পৌছানো এবং এগুলো ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনরূপ ভুল থাকতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞানসমূহ হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব এবং তৎসম্পর্কিত নির্দিষ্ট আইনসমূহ থেকে উদ্ভুত। এগুলো সম্পর্কে মূল কুরআনে কোন উল্লেখ নেই। একজন কর্তৃক বর্ণিত সুন্নাহ (আহাদ) ব্যতীত এগুলোর বেশির ভাগ জ্ঞান সম্পর্কে সুন্নাহর মূল বিবরণেও কোন উল্লেখ নেই।

সুতরাং এভাবেই ইমাম শাফেঈ (র:) একজন মাত্র রাবী কর্তৃক বর্ণিত (খবর আল-ওয়াহি) হাদীসের এক নতুন বিষয়ের আলোচনার অবতারণা করেন। এ বিশেষ পরিভাষার ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে তিনি কোন্ কোন্ শর্তের ভিত্তিতে খবর আল-ওয়াহিদ গ্রহণযোগ্য হবে অথবা হবে না সে সম্পর্কে আলোচনা করেন। এ প্রসঙ্গে সাক্ষ্য প্রদান, প্রতিবেদন অর্থাৎ শাহাদা ও রিওয়াত-এর মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এ সকল বিষয়ে একজন মাত্র রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে কি না এবং এ সকল বিষয়ে শুধুমাত্র খবর আল-ওয়াহিদ যথেষ্ট কি না সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইমাম শাফেঈ (র:) খবর আল-ওয়াহিদ এর বৈধতা সম্পর্কে এবং এ ধরনের হাদীস সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপনযোগ্য কি না সে ব্যাপারেও আলোচনা করেন। উপসংহারে তিনি অত্যন্ত সুন্দর যুক্তি সহকারে বলেছেন যে, বাস্ত বিকপক্ষে এসব হাদীস দলীল-প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এভাবে ইমাম শাফেঈ (র:) তাঁর প্রতিপক্ষ কর্তৃক উথাপিত সকল সংশয় খণ্ডনে কামিয়াব হন।

এছাড়া নিম্নবর্ণিত অধ্যায়সমূহ উক্ত গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে :

– আল ইজমা : এর সংজ্ঞা এবং আইনগত বৈধতা।

– আল কিয়াস : তাৎপর্য, প্রকৃতি, প্রয়োজনীয়তা, বিভিন্ন প্রকারের কিয়াস এবং এর প্রয়োগে কে উপযুক্ত এবং কে উপযুক্ত নয়।

– ইজতিহাদ : কিভাবে ইজতিহাদ প্রথমত কুরআন এবং অত:পর সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত, কিভাবে নির্ভুল এবং ভুল ইজতিহাদ করা হয়ে থাকে।

– ইসতিহসান, আইনগত অগ্রাধিকার : ইমাম শাফেঈ (র:) এ ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন যে, কোন মুসলমানকে হাদীসের বিরোধিতা করার জন্য ইসতিহসান করার অনুমতি দেয়া যায় না। কিংবা ইসতিহসান এমন কোন আইনগত সিদ্ধান্ত প্রদানের অনুমতি দেয় না যা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা বা কিয়াস-এর উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তিনি কিয়াস এবং ইসতিহসান-এর মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করেন।

– আলেমগণের মতপার্থক্য সম্পর্কে ইমাম শাফেঈ (রঃ) তাঁর ব্যাখ্যায় বলেন যে, এ সকল মতপার্থক্য দু'প্রকারের। নিষিদ্ধ বিষয়ে মতপার্থক্য এবং আরেক প্রকারের মতপার্থক্য যা নিষিদ্ধ বিষয়ে নয়। যে সকল বিষয়ে মতপার্থক্য করার অনুমতি নেই সেগুলো হচ্ছে এমন সব বিষয় যে সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহে স্পষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ মজুদ আছে। যে সকল বিষয়ে মতপার্থক্য করার অনুমতি আছে সেগুলো হচ্ছে এমন সব বিষয় যেগুলোকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যায় এবং যেসব বিষয় সম্পর্কে প্রত্যেক আলেম তাঁর নিজস্ব যুক্তি প্রয়োগ করে থাকেন। ইমাম শাফেঈ (রঃ) উভয় প্রকার মতপার্থক্যের উদাহরণ পেশ করেছেন এবং এগুলোর কারণও উল্লেখ করেছেন। সাহাবীগণ যে সকল বিষয়ে মতপার্থক্য করেছিলেন তিনি সে সকল উদাহরণ তুলে ধরেন। যেমন ইদ্দাত, শপথ এবং উত্তরাধিকার। আলোচ্য অধ্যায় ইমাম শাফেঈ (রঃ) সাহাবীগণের মধ্যে যে বিষয়ে মতপার্থক্য ছিল সেগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকার প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করেছেন।

ইমাম শাফেঈ (রঃ)-এর উপরোক্ত মতামতের সমর্থনে "বিভিন্ন শ্রেণীর সাক্ষ্য প্রমাণ" শিরোনাম রচিত একটি অধ্যায়ের মাধ্যমে আর-রিসালাহ্ গ্রন্থখানি সমাপ্ত হয়েছে :

"আমরা সিদ্ধান্ত প্রদান করি প্রধানতঃ কুরআন ও সর্বসম্মত সুন্নাহর ভিত্তিতে, যে সুন্নাহর ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই এবং বলি, কুরআন ও সুন্নাহর মূল উৎসের বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য পর্যালোচনা করে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। যদি আমরা অল্প কয়েকজনের নিকট থেকে বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হই, যে হাদীসের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তাহলে আমরা বলি, আমরা হাদীসখানি যেভাবে আছে সেভাবে গ্রহণ করলাম, কিন্তু আমরা সচেতন আছি যে, এর বর্ণনাকারীগণের ব্যাপারে অজানা কোন ত্রুটি থাকতে পারে। এরপর আমরা ইজমা এবং তারপর কিয়াসের কথা বলব। কিয়াস ইজমা অপেক্ষা দুর্বল। কিয়াস শুধুমাত্র প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে, কারণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন সরাসরি বিবরণ (হাদীস) থাকলে সে ক্ষেত্রে কিয়াস ব্যবহার করা আইনসম্মত নয়।"

ইমাম শাফেঈর (রঃ) গ্রন্থাবলী থেকে আমরা জানতে পারি ইসলামী আইনের কোন্ কোন্ উৎসের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ঐ সময়ে কি কি কারণে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল।

যে সকল উৎসের ব্যাপারে মতৈক্য ছিল তা হলো সামগ্রিকভাবে সুন্নাহ এবং বিশেষভাবে (যাকে ইমাম শাফেঈ খাস্সাহ নামে অভিহিত করেছেন) খবর আল-ওয়াহিদ[১৫] বর্ণনাসমূহ। তবে ইমাম শাফেঈর (রহঃ) এ ব্যাপারে অবদান এই যে, তিনি দুটি বিষয়ে তাঁর রচিত রিসালাহ এবং জিমাউল ইলম গ্রন্থে স্বয়ংসম্পূর্ণ আলোচনা করেছেন।

অন্যান্য যে সকল বিষয়ে মতপার্থক্য ছিল সেগুলো হচ্ছে :

১. ইজমা : দলীল-প্রমাণ হিসেবে ইজমার বৈধতা, ইজমার প্রকারভেদ, কার ইজমা প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে, কোন্ বিষয়ের ইজমাকে সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যাবে, কিভাবে জনসাধারণকে অবহিত করা যাবে যে, কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে ইজমা রয়েছে– ইত্যাদি বিষয়ে মতপার্থক্য ছিল।

২. কিয়াস ও ইসতিহসান : এর পরিভাষাগত তাৎপর্য, তাদের প্রকৃতি, প্রমাণ হিসেবে এর বৈধতা, সম্ভাব্যতা এবং প্রয়োগের পদ্ধতি এবং সাহাবীগণের কাজকে কিয়াস বা ইসতিহসান হিসেবে বিবেচনা করা যাবে কি না ইত্যাদি ব্যাপারে মতপার্থক্য ছিল।

৩. কুরআনের আদেশ-নিষেধের গুরুত্ব : এ সকল আদেশ-নিষেধের তাৎপর্য এবং অন্যান্য আইনগত ও ফিকাহ বিষয়ক সিদ্ধান্তের উপর এগুলোর প্রভাব সম্পর্কে প্রকাশ্য মতপার্থক্য ছিল। লক্ষণীয় যে, এ যুগে চারজন সুন্নী ইমাম আত-তাহরীম (নিষেধাজ্ঞা) ও আল-ইজাব (বৈধতা) ইত্যাদি পরিভাষার সুনির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা ব্যবহার করেন নি এবং তাঁদের ব্যবহৃত বাক্যে এগুলো সাধারণভাবে ব্যবহৃতও হয়নি। বরং ইবনে কাইয়িমের[১৬] বিবরণ অনুযায়ী এ ধরনের আইনগত পরিভাষা পরবর্তী কালে উদ্ভূত হয়েছে।

৪. ইসলামী আইনের অন্যান্য যে সকল উৎসের ব্যাপারে মতপার্থক্য ছিল, সেগুলো সাধারণত প্রাথমিক যুগের বিচারকগণ আলোচনা করেননি। যেমন উরফ (প্রথা), আদাহ (অভ্যাস) এবং ইসতিসহাব ইত্যাদি পরিভাষা তখনকার সময়ে ব্যবহৃত শব্দাবলীতে লক্ষ্য করা যায়নি।

---

১৫. কোন পর্যায়ে হাদীসের রাবীর সংখ্যা একজন হলে উক্ত হাদীসকে খবর আল-ওয়াহিদ বলে।

১৬. ইবনে কাইয়িম, প্রাগুক্ত, ১খ, ৩২।

ইমাম শাফেঈ (রঃ)-র পরবর্তী যুগের উসূলে ফিকাহ

ইমাম শাফেঈ (রঃ) রচিত রিসালাহ (ক্ষুদ্র পুস্তিকা) প্রকাশিত হওয়ার মুহূর্ত থেকে ইসলামী আইন সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে তা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। বস্তুত এর ফলে গবেষকগণ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। অধিকাংশ আহলে হাদীসের একটি দল গ্রন্থখানিকে গ্রহণ করেন এবং ইমাম শাফেঈর (রঃ) আইন বিষয়ক চিন্তাধারার সমর্থনে এটিকে ব্যবহার করেন। অন্য দলটি এ গ্রন্থে বর্ণিত প্রায় সকল বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করেন। জনসাধারণের উপর সম্ভাব্য প্রভাব পড়ার আগেই তাঁরা তাদের নিজস্ব পদ্ধতি ও অনুশীলনের সাথে ইমাম শাফেঈ (রঃ)-এর গ্রন্থে বর্ণিত যে কোন বিরোধমূলক বিষয়কে খণ্ডন করার চেষ্টা করেন। এ দলের সদস্যগণ ছিলেন স্পষ্টতই আহলে রায়ের সমর্থক (হানাফীগণ)। তাঁরা ইমাম শাফেঈ (রঃ) যা যা লিখেছিলেন তার প্রায় সকল বিষয়ের সাথে তাঁদের সম্পূর্ণরূপে মতপার্থক্যের কথা উল্লেখ করেন।

ইবনুন নাদীম রিসালাহ্ গ্রন্থের পরে উসূলে ফিকাহ্ বিষয়ে লিখিত গ্রন্থসমূহের নাম উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (মৃঃ ২৩৩ হিঃ) রচিত আন-নাসিখ ওয়াল-মানসূখ এবং আস-সুন্নাহ গ্রন্থ দুটিও অন্তর্ভুক্ত। আস-সুন্নাহ গ্রন্থখানিতে আসলে আইন সম্পর্কিত বিষয়াবলী অপেক্ষা তাওহীদ এবং ইসলামের মৌল বিশ্বাস তথা আকাইদ সম্পর্কিত আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। উক্ত গ্রন্থের দু'টি মুদ্রিত সংস্করণ পাওয়া যায়। বৃহত্তর সংস্করণটি ১৩৪৯ হিজরীতে মক্কায় মুদ্রিত হয়। এর পাণ্ডুলিপি কপিসমূহ যথাক্রমে মিসর দামেস্কের দারুল কুতুব এবং জাহিরিয়াহ গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়। আরেকটি ক্ষুদ্র সংস্করণ কায়রোতে তারিখবিহীনভাবে প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থে নিষ্ঠাবান সুন্নী বা আহলে সুন্নাহর মৌল বিশ্বাসসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইমাম আহমাদ "তআতুর-রাসূল" (রাসূলের আনুগত্য) নামে আরেকখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইবন কাইয়িম তাঁর প্রণীত ইলামুল-মুয়াক্কিঈন গ্রন্থে উক্ত গ্রন্থ

থেকে বহু উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এতে অনুমান করা যায় যে, তাঁর নিকট উক্ত গ্রন্থের কপি ছিল। আমি বহু স্থানে গ্রন্থখানির কপি অনুসন্ধান করেছি কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই তা পেতে ব্যর্থ হয়েছি। ইবনে কাইয়িম-এর গ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহ থেকে স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, বস্তুত আইন ও সুন্নাহ সম্পর্কিত উসূল বিষয়ে এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। সম্ভবতঃ ইবনে কাইয়িমের পরবর্তী যুগে গ্রন্থখানি হারিয়ে গেছে অথবা অন্য কোন গ্রন্থের সাথে একত্রে বাঁধাই করা হয়েছে অথবা শিরোনাম পৃষ্ঠা হারিয়ে গেছে, যা অনেক খোঁজাখুঁজির পর পাওয়া যেতে পারে।

বিভিন্ন উৎস থেকে জানা যায় যে, দাউদ জাহিরী (মৃঃ ২৭০ হিঃ) কর্তৃক ইজমা (সর্বসম্মত মত), ইবতালুত-তাকলীদ (অনুকরণ বন্ধ করা প্রসঙ্গে) খবর আল-ওয়াহিদ (একজনমাত্র বর্ণনাকারী সম্পর্কিত), খবর আল-মুজিব (অবশ্য পালনীয় বর্ণনা সম্পর্কিত), আল খুসূস ওয়াল-উমূম (বিশেষ ও সাধারণ বিষয় সম্পর্কিত), আল-মুফাসসার ওয়াল-মুজমাল (সংক্ষিপ্ত ও বিশদ), আল-কাফী ফী মুকাবালাতিল-মুত্তালিবী (অর্থাৎ ইমাম শাফেঈর মুকাবিলা) মাসালাতান খালাফা ফীহিমা আশ-শাফেঈ (যে দুটি বিষয়ে তিনি ইমাম শাফেঈর সাথে মতভেদ করেছিলেন) ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন।

এ সময় ইমাম আবু হানিফার (রঃ) চিন্তাধারার অনুসারী আলেমগণ শাফেঈ (রঃ) রচিত রিসালাহ দুটি কারণে গভীরভাবে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। প্রথমতঃ উক্ত গ্রন্থের যে সকল বিষয় সম্পর্কে তাঁরা দ্বিমত পোষণ করেন সে সকল বিষয়কে খণ্ডন করা এবং দ্বিতীয়তঃ উক্ত গ্রন্থের অনুসরণে ইমাম আবু হানিফার ফতোয়ার ভিত্তিতে আইন শাস্ত্রের নিজস্ব নীতিমালা (উসূল) প্রণয়ন করা।

এ বিষয়ে হানাফী গবেষকগণ বহু গ্রন্থ রচনা করেন। যেমন– ঈসা ইবনে আবান (মৃঃ ২২০ হিঃ) কর্তৃক খবর আল-ওয়াহিদ, ইসবাতুল-কিয়াস (সাদৃশ্যমূলক অবরোহ পদ্ধতি বৈধকরণ) এবং ইজতিহাদুর-রায় (আইনগত যুক্তি পদ্ধতির অনুশীলন) ইত্যাদি গ্রন্থ রচিত হয়।

আল-বারজাঈ (মৃতঃ ৩১৭ হিঃ) রচনা করেছেন মাসাইলুল-খিলাফ (মতপার্থক্যের বিষয়সমূহ) নামক গ্রন্থ। তিউনিসের যায়তুনাহ গ্রন্থাগার, ক্রমিক সংখ্যা ১৬১৯। আবু জাফর আত-তাহাবী (মৃঃ ৩২১ হিঃ) ইখতিলাফুল-ফুকাহা (ফকীহগণের মতপার্থক্য) নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। আবু বকর আল-জাসসাস (মৃঃ ৩৭০ হিঃ) উক্ত গ্রন্থখানিকে সংক্ষিপ্ত করেন। কায়রোতে এ গ্রন্থের

একখানা কপি আছে। বিস্তারিত জানার জন্য মাহাদ আল-মাখতুতাত (১/৩২৯)-এর ইনডেক্স দেখা যেতে পারে।[১]

আল-কারাবীসী আন-নাজাফী (মৃঃ ৩২২ হিঃ) লিখেছেন আল-ফারুক (পার্থক্যসমূহ), যার পাণ্ডুলিপিসমূহ ইস্তাম্বুলের তৃতীয় আহমদ এবং ফায়জুল্লাহ গ্রন্থাগারসমূহে পাওয়া যায়।

আইন বিষয়ের বেশ কয়েকটি শিরোনামবিহীন প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ইবনে সামাহ (মৃঃ ২৩৩) কর্তৃক রচিত বলে মনে করা হয়ে থাকে।[২]

আল-কানানী (মৃঃ ২৮৯ হিঃ) রচনা করেছেন আল-হুজ্জাহ ফীর রাদ আলাশ শাফেঈ (ইমাম শাফেঈর জবাবে প্রমাণসমূহ)।

আলী ইবন মূসা আল-কুমমী হানাফী (মৃঃ ৩০৫) লিখেছেন মা খালাফা ফীহি আশ-শাফেঈল ইরাকীইন ফী আহকামিল কুরআন (কুরআনের আইনগত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে শাফেঈ যে সকল বিষয়ে ইরাকীদের বিরোধিতা করেছেন তাঁর নমুনা), ইসবাতুল-কিয়াস; আল-ইজতিহাদ এবং খবর আল-ওয়াহিদ ইত্যাদি।

আবুল হাসান আল-কারখী (মৃঃ ৩৪০ হিঃ) লিখেছেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আল-উসূল' (উৎসসমূহ) যা কায়রো থেকে অন্য আরো কয়েকটি গ্রন্থসহ একত্রে মুদ্রিত হয় (তারিখবিহীন)।

ইমামীয়া পন্থী (শীআ) আবু সাহল আন-নওবাখতী (মৃঃ ৯৩ হিঃ) লিখেছেন, 'নাকদু রিসালাতিশ-শাফেঈ' (শাফেঈর রিসালাহ গ্রন্থের সমালোচনা), 'ইবতালুল কিয়াস' (কিয়াস নাকচকরণ) এবং 'আর-রাদ আলা ইবনির-রাওয়ানদী ফী বাদ আরাইহী আল-উসূলীয়াহ' (ইবনে রাওয়ানদীর কয়েকটি আইনগত মতামত খণ্ডন) ইত্যাদি গ্রন্থ। যায়দিয়া দলের অনুসারী ইবনে জুনাইদ (মৃঃ ৩৪৭) লিখেছেন "আল-ফাসখ আলা মান আজাযা আন-নাসখ লিমা তাম্মা শারুহু ওয়া জাল্লা নাফ্উহু" (ইতিমধ্যে জারিকৃত এবং উপকারী বলে প্রমাণিত আইনসমূহকে যারা রহিত করার অনুমতি দিয়েছেন তাঁদের মতামত বাতিলকরণ) এবং আল-

---

১.পাকিস্তানের ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট জাসসাসের উক্ত সংক্ষেপিত গ্রন্থের অংশবিশেষ প্রকাশ করেছে। যাইহোক উক্ত খণ্ডের সম্পাদক ভুলবশতঃ এটিকে আবু জাফর আত-তাহাবীর রচিত গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেছেন। (সম্পাদক)

২. দেখুন ইবনুন-নাদীম, আল-ফিহরিস্ত, পৃঃ ২৮৪।

ইফহাম লি-উসূলিল আহকাম (বিচার সম্বন্ধীয় নীতিমালা অনুধাবন) ইত্যাদি গ্রন্থ।

ইমাম শাফেঈর (রঃ) চিন্তাধারার অনুসারীগণ কর্তৃক নিম্নবর্ণিত গ্রন্থাবলী প্রণীত হয়ঃ

আবু ছাওর (মৃঃ ২৪০ হিঃ) লিখেছেন 'ইখতিলাফুল-ফোকাহা' (ফকীহগণের মতপার্থক্য)। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে নাসর আল-মারওয়াযীও (মৃঃ ২৯৪ হিঃ) একই বিষয়ের উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন।

আবু আব্বাস ইবনে সুরাইজ (মৃঃ ৩০৫ হিঃ) তাঁর রচিত গ্রন্থে ঈসা ইবনে আবান এবং মুহাম্মদ ইবন দাউদ আল-যাহিরী যে সকল বিষয়ে ইমাম শাফেঈর (রঃ) সাথে মতানৈক্য করেছিলেন সে সকল বিষয়কে খণ্ডন করার চেষ্টা করেন।

ইবরাহীম ইবন আহমদ আল-মারওয়াযী (মৃঃ ৩৪০) লিখেছেন 'আল-উমূম ওয়াল-খুসূস' (সাধারণ ও বিশেষ বিষয়) এবং 'আল-ফুসুল ফী মারিফাতিল উসূল'[৩] (আইনতত্ত্ব সম্পর্কিত জ্ঞানের কয়েকটি অধ্যায়) ইত্যাদি গ্রন্থ।

কোন কোন গবেষক এ সময়ে ইমাম শাফেঈ (রঃ) রচিত রিসালাহ গ্রন্থের উপর টিকা ও ভাষ্য প্রণয়নের প্রতি মনোনিবেশ করেন। তাঁদের মধ্যে আবু বকর আস-সায়রাফী (মৃঃ ৩৩০), আবুল ওয়ালিদ আন-নিসাবূরী (মৃঃ ৩৬৫ বা ৩৬৩), আবু বকর আল-জাওয়াকী (মৃঃ ৩৮৮) এবং বিখ্যাত ইমামুল হারামাইনের পিতা, ইমাম গায্যালীর শিক্ষক আবু মুহাম্মদ আল-জুয়াইনী উল্লেখযোগ্য।

রিসালাহ গ্রন্থের টিকাকার হিসেবে আরো পাঁচজন গবেষক পরিচিতি লাভ করেছেন। তাঁরা হলেন আবু যায়দ আল-জাযূলী, ইউসুফ ইবন উমার, জালালুদ্দিন আফকাহসী, ইবনুল ফাকিহানী এবং আবুল কাসিম ঈসা ইবন নাজী। সপ্তম শতাব্দী পরবর্তীকালে এ সকল টিকাকারকে গবেষকগণ আধুনিক যুগের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে উদ্ধৃত করতে শুরু করেন।

শায়খ মুস্তাফা আবদুর রাজ্জাক[৪] উল্লেখ করেন যে, প্যারিসের পাবলিক লাইব্রেরিতে রিসালাহর উপর জুয়াইনী কর্তৃক টিকা সম্বলিত গ্রন্থের একখানা কপি আছে। তিনি তা থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে

---

৩. ইবন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৯।

৪. দেখুন, আবদুর রাজ্জাক, প্রাগুক্ত।

প্যারিসে উক্ত পাণ্ডুলিপিখানা দেখার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু পাইনি। হয়তোবা এটি বিভিন্ন শিরোনামযুক্ত অন্যান্য বইয়ের সাথে রাখা হয়েছে, সম্ভবত এটি পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে সবগুলো পাণ্ডুলিপি এক এক করে খুঁজে দেখা। যাই হোক এরূপ ভীতিকর কাজ হাতে নিতে হলে গবেষককে যথেষ্ট সময় নিয়ে এগুতে হবে।

ইমাম শাফেঈ (রঃ)-র পরবর্তী যুগে উসূলে ফিকাহর বিকাশ

উপরোল্লিখিত সময়কে বিকাশকাল বলা কষ্টকর। কেননা মূলতঃ এ সময় অতিবাহিত হয়েছে রিসালাহর সমালোচনা, সমর্থন অথবা টিকা লিখনের মধ্য দিয়ে, বস্তুতঃ এর অধিক কিছু নয়। এ ধারা একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। সে সময়কে একই সাথে উসূলে ফিকাহর গুরুত্বপূর্ণ বিকাশকাল শুরু হওয়ার পর্যায় হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

এ সময় কাজী আল-বাকিল্লানী (মৃঃ ৪০২ হিঃ) এবং কাজী আবদুল জাব্বার আল-হামাদানী (মৃঃ ৪১৫ হিঃ) শরীয়াহ সম্পর্কিত উসূলের (আইনতত্ত্বের) অনুশীলন ও নীতিমালাসমূহ সামগ্রিকভাবে পুনর্লিখনের কাজ হাতে নেন।

আল-যারকাশী তাঁর প্রণীত গ্রন্থ আল-বাহর-এ লিখেছেন,.......দু'জন বিচারক যথাক্রমে আহলে সুন্নাহর কাজী আবু বকর তায়িব্য আল-বাকিল্লানী এবং মুতাযিলাদের কাজী আবদুল জাব্বার আত্মপ্রকাশ করলেন তাঁরা আগে যে সকল লেখা ছিল সেগুলোকে আরো সম্প্রসারিত করলেন, আগে যে সকল বিষয় সাধারণ ইঙ্গিতের বেশি কিছু ছিল না সেগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করলেন, সাধারণভাবে বর্ণিত বিষয়সমূহকে আরো বিশদ বর্ণনা করলেন এবং সকল অস্পষ্টতা দূরীভূত করলেন।

কাজী আল-বাকিল্লানী তাঁর গ্রন্থ আত-তাকরীব ওয়াল-ইরশাদ (ব্যাখ্যা ও নির্দেশনা) প্রণয়নের পর শায়খুল উসূলিয়ীন (উসূল গবেষকগণের নেতা)[৫] উপাধি লাভ করেন। কয়েক শতাব্দীকাল যাবত গ্রন্থখানি পাওয়া যাচ্ছে না, যদিও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য একাধিক উদ্যোগের মাধ্যমে এটি খুঁজে পাওয়া যেতে

---

৫. দেখুন Al Qurrafi, Nafais, 1, 1-19।

পারে। যাইহোক উসূলের গবেষকগণ হিজরী নবম শতাব্দী পর্যন্ত এ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন।

কাজী আবদুল জাব্বার তাঁর মতানুসারে আল-আহদ (অঙ্গীকারনামা) অথবা আল-আমাদ (স্তম্ভসমূহ) শিরোনামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং এতে তাঁর নিজস্ব টিকাও লেখেন।

ইমামুল হারামাইন (মৃঃ ৪৭৮ হিঃ) আল-বাকিল্লানী রচিত আত-তাকরীব ওয়াল ইরশাদ গ্রন্থের সারসংক্ষেপ রচনা করেন। সংক্ষেপিত উক্ত গ্রন্থের নাম ছিল আত-তালখীস (সারসংক্ষেপ কিংবা আল-মুলাখ্খাস (সারসংক্ষেপ), যার কিছু কিছু পৃষ্ঠ কিছু প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহে পাওয়া যায়। পরবর্তী যুগের আইন শাস্ত্রের গবেষকগণ আল-বাকিল্লানীর বেশ কিছু ধারণা তাদের নিজস্ব পুস্তকে অন্ত র্ভুক্ত করেন।

ইমামুল হারামাইনের উসূল (আইনতত্ত্ব) সম্পর্কিত আল-বুরহান (প্রমাণ) গ্রন্থটি আল-বাকিল্লানী রচিত আত-তাকরীব-এর উপর ভিত্তি করে রচিত। উক্ত গ্রন্থে আইনতত্ত্বের সকল শাখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যদিও এতে স্বাধীন পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে।[৬] তিনি তাঁর শিক্ষক ইমাম আল-আশআরী (রঃ) এবং ইমাম শাফেঈর (রঃ) সাথে বেশ কয়েকটি বিষয়ে দ্বিমত প্রকাশ করেন। এ কারণে ইমাম শাফেঈ (রঃ)-র চিন্তাধারার অনুসারী সমসাময়িক গবেষকগণ আল-বুরহানে প্রদত্ত টীকা প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং এর প্রতি প্রয়োজনীয় গুরুত্ব প্রদান করেননি। যদিও তাঁরা তাঁদের নিজেদের পুস্তকে উক্ত পুস্তকের বিভিন্ন অংশ গ্রহণ করেছেন।

দু'জন মালিকী গবেষক যথাক্রমে ইমাম আবু আবদুল্লাহ আল-মাআযিরী (মৃঃ ৫৩৬ হিঃ) এবং আবুল হাসান আল-আবআরী (মৃঃ ৬১৫ হিঃ) আল-বুরহান গ্রন্থের উপর টীকা লিখেছেন। তৃতীয় আরেক জন মালিকী গবেষক আবু ইয়াহ্ইয়া উপরোক্ত দুটি টীকা একত্র করে প্রকাশ করেন। উল্লেখিত তিনজন গবেষকই অত্যন্ত কঠোর ভাষায় অনেকটা অযৌক্তিকভাবে ইমামুল হারামাইনের সমালোচনা করেন। তাঁরা ইমাম আশআরীর মতামতকে ইমামুল হারামাইন কর্তৃক খণ্ডন করার প্রচেষ্টাকে ঔদ্ধত্য বলে বিবেচনা করেন এবং "আল-মাসালিহ আল-মুরসালাহ" প্রশ্নে ইমাম মালিকের মতামত খণ্ডন করার চেষ্টা করেন।

---

৬. সম্প্রতি কাতার থেকে আল-বুরহানের একটি সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

ইমাম শাফেঈর গ্রন্থে ইমামুল হারামাইন একটি ভূমিকা সংযোজন করেছেন এবং তাতে এমন কিছু বক্তব্য যোজনা করেছেন যা রিসালাহ্-এ পাওয়া যায় না। অবশ্য তিনি তাঁর আলোচনা এভাবে শুরু করেছেন : কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ের তত্ত্বীয় আলোচনায় নিয়োজিত হতে চাইলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার গভীর জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন যে, উসূলে ফিকাহ্ সম্পর্কিত জ্ঞানের উৎস হল ইলমুল কালাম (সূক্ষ্ম ধর্মতত্ত্ব), আরবী ভাষা এবং ফিকাহ্ শাস্ত্র। অত:পর তিনি আইনগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া, এ সম্পর্কে পালনীয় কর্তব্য এবং আইনগত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বিভিন্ন বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনার পাশাপাশি কোন্ বিষয় যুক্তির সাহায্যে এবং কোন্ বিষয় ধর্মের ব্যাখ্যার সাহায্যে উপলব্ধি করতে হবে সে সকল বিষয় ব্যাখ্যা করেন। উপরে বর্ণিত সকল বিষয়ের উপর এ আলোচনাকে আল-বায়ান (সুস্পষ্ট ঘোষণা) কথাটির পরবর্তী বিস্তারিত ব্যাখ্যার ভূমিকা হিসেবে তুলে ধরেন। আল-বায়ান সম্পর্কিত আলোচনার মাধ্যমেই ইমাম শাফেঈ (র:) তাঁর রিসালাহ্ শুরু করেছিলেন। এটা খুবই স্পষ্ট যে, আল-বায়ান এবং রিসালাহ্ গ্রন্থে বর্ণিত অন্যান্য পরিভাষা সম্পর্কে ইমামুল হারামাইন যেভাবে আলোচনা করেছেন তাতে দেখা যায় যে, তিনি আল-বায়ানসহ অন্যান্য পরিভাষার সংজ্ঞা ইমাম শাফেঈ অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্টরূপে প্রদান করেছেন। তিনি পরিভাষাসমূহের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, সারমর্ম ব্যাখ্যা করেছেন, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতপার্থক্যসমূহ উল্লেখ করেছেন এবং এগুলোর বিভিন্ন শ্রেণী নির্দেশ করেছেন। এছাড়া তিনি অন্য একটি বিষয়েও আলোচনা করেছেন যা ইমাম শাফেঈ করেননি। তা হচ্ছে, তাখীরুল বায়ান ইলা ওয়াকতিল হাজাত (প্রয়োজনীয় সময় পর্যন্ত আল বায়ানের অনুবর্তী হওয়া) এবং এ সম্পর্কিত মতপার্থক্যসমূহ। বিভিন্ন প্রকারের আল-বায়ান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ইমাম শাফেঈ (র:) কর্তৃক উল্লেখিত পাঁচটি শ্রেণীর কথা পুনরুল্লেখ করেন। এ বিষয়ে আবু বকর দাউদ আল-বায়ানের কথা উল্লেখ করেন।

ইমামুল হারামাইন এ মত পোষণ করতেন যে, আল-বায়ান অর্থ হচ্ছে সাক্ষ্য-প্রমাণ। সাক্ষ্য-প্রমাণ দু'প্রকারের। যেমন আকলী (বুদ্ধিবৃত্তিক) এবং সাম'য়ী (শ্রুত অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত)। সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসেবে 'সাম'ঈর ভিত্তি হচ্ছে অলৌকিক কুরআন। সুতরাং সাক্ষ্য-প্রমাণ কুরআনের সাথে যত বেশি ঘনিষ্ঠ হবে তা তত বেশি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হবে। অতএব সাম'ঈ সাক্ষ্য-প্রমাণসমূহের

অগ্রাধিকার ভিত্তিক ক্রমবিন্যাস হচ্ছে নিম্নরূপঃ আল-কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, খবরে ওয়াহিদ এবং কিয়াস।

অত:পর তিনি ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, আইন শাস্ত্রের গবেষকগণ ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করলেও আরবীভাষী গবেষকগণ আওয়ামির (আদেশসমূহ) নাওয়াহী (নিষেধাজ্ঞাসমূহ), আল-উসুম ওয়া আল-খুসুম (সাধারণ ও বিশেষ বিষয়সমূহ) ইত্যাদির মতো বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা করেননি। কিন্তু ইমাম শাফেঈ উল্লেখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

ভাষাতত্ত্বের এ সকল দিক নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আল-বাকিল্লানীর কিছু কিছু ধারণা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, আল বাকিল্লানী ইতিমধ্যেই ইমাম শাফেঈ (রঃ)-এর পদ্ধতির সাথে উল্লেখিত বিষয়াদি সংযোজন করেছেন।

ইমাম গায্যালী (রঃ) ইমামুল হারামাইনের ছাত্র বিধায় তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বস্তুত ইমাম গায্যালী উসূল সম্পর্কে মোট চারখানা গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে প্রথম গ্রন্থখানির নাম ছিল আল-মানখুল (যাচাই-বাছাইকৃত)। মধ্যম আকারের এ গ্রন্থখানি লেখা হয়েছিল উসূলের প্রাথমিক অথবা মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয় গ্রন্থখানি সম্পর্কে শুধুমাত্র আল-মুস্তাসফা নামক গ্রন্থে উল্লেখ ছাড়া আর কিছুই জানা যায়নি। আরো জানা যায় যে, গ্রন্থখানির নাম ছিল তাহযীবুল-উসূল (উসূলের পরিশুদ্ধকরণ) তাঁর লেখা তৃতীয় গ্রন্থের নাম শিফাউল-গালীল ফী বায়ানিশ-শিবহ ওয়াল-মুখাইয়াল ওয়া মাসালিকিত তালীল। গ্রন্থখানি ১৩৯০/১৯৭১ সনে বাগদাদ থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। উসূল সম্পর্কে আল-গায্যালীর সর্বশেষ এবং চতুর্থ গ্রন্থ হচ্ছে আল-মুস্তাসফা, যা মূলতঃ উসূলে ফিকাহ বিষয়ক বিশ্বকোষ বিশেষ। এটি মিসর ও অন্যান্য স্থান থেকে বহুবার প্রকাশিত হয়েছে।[৭] ইমাম গায্যালী (রঃ) তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় এ্যারস্টটলীয় যুক্তিবিদ্যার প্রায় সকল দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন। এ বিষয়ে তাঁর ছিল গভীর আগ্রহ। অত:পর তিনি হদ্দ (বিধিবদ্ধ শাস্তি)

---

৭. দেখুন, আল-গায্যালী রচিত আল-মুস্তাসফা, ১খ, ১৮৭, গ্রন্থখানির আকর্ষণীয় ইংরেজি অনুবাদ করেছেন ডঃ আহমদ যাকী হাম্মাদ। শীঘ্রই তা প্রকাশিত হবে, ইনশাআল্লাহ।

এবং যে সকল শর্ত আবশ্যিকরূপে পূরণ সাপেক্ষে তা কার্যকর করা যায় সে সম্পর্কে এবং আরও বিভিন্ন প্রকারের হদ্দ সম্পর্কে আলোচনা করেন। পরবর্তী পর্যায়ে আলোচিত হয় দলীল (সাক্ষ্য-প্রমাণ) ও এর প্রকারভেদ সম্পর্কে।

এ প্রসঙ্গে আলোচ্য গ্রন্থে তিনি তাঁর বক্তব্যের কাঠামো তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন শিরোনামে উসূল সম্পর্কিত সকল বিষয় আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর শিক্ষক ইমামূল-হারামাইন এবং তাঁর পূর্বসূরী আল-বাকিল্লানীকে বিশেষভাবে অনুসরণ করেন। তাঁর শিক্ষক যেমন ইমাম শাফেঈ এবং আল-আশআরীর সাথে ভিন্নমত পোষণ করতেন, ইমাম গায্যালীও তেমনি তাঁর পূর্ববর্তীদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম গায্যালীর সমসাময়িক গবেষকগণের অনেকে তাঁর মতামত গ্রহণ করেছেন আবার অনেকে তাঁর মতামত গ্রহণ করেননি।

এগুলো ছিল উসূলের গবেষণার ক্ষেত্রে ইমাম শাফেঈ (র:)-এর অনুসারীগণের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

মুতাযিলাপন্থীগণও উসূলের বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। কাজী আবদুল জাব্বার কর্তৃক আল-আমাদ/আল আহ্দ গ্রন্থখানি প্রণয়ন এবং এর উপর পূর্ণাঙ্গ টীকা রচনা করার পর তিনি উসূল সম্পর্কে তাঁর রচিত বিশ্বকোষে কিছু মতামত লিপিবদ্ধ করেন। এর অংশবিশেষ 'আল-মুগনী' শিরোনামের অধীন মুদ্রিত ও আলোচিত পাওয়া যাবে। উক্ত বিশ্বকোষের সপ্তদশ খণ্ডটি সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত হয়েছে উসূল সম্পর্কিত গবেষণায়। যেহেতু ইমামুল-হারামাইন নিজেকে আল-বাকিল্লানী রচিত গ্রন্থের সাথে সম্পৃক্ত করেছিলেন, সেহেতু আবুল হাসান আল-বাসরী আল-মুতাযিলীও (মৃঃ ৪৩৫ হিঃ) নিজেকে কাজী আবদুল জাব্বারের সাথে সম্পৃক্ত করেন এবং "আল আমাদ/আল আহদ"-এর উপর টীকা রচনা করেন। তাঁর টীকা ভাষ্য অত্যধিক দীর্ঘ হয়েছে বুঝতে পেরে তিনি আল-মুতামাদ (নির্ভরযোগ্য) নামে আরেকখানা সারসংক্ষেপ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয়েছে এবং তা সহজলভ্য।

এ যুগে শায়খ আবু ইসহাক আশ-শিরাযী (মৃঃ ৪৬৭ হিঃ) আল-লামউ (উজ্জ্বল আলো) এবং আত-তাবসিরাহ (জ্ঞানালোক) নামে দু'টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং দু'টি গ্রন্থই মুদ্রিতাকারে পাওয়া যায়।

কাজী আবু ইয়াহ্ইয়া আল-ফাররা আল-হাম্বলী উসূল সম্পর্কে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানির নাম আল-উদ্দাহ্ ফী উসূলিল ফিক্হ (উসূলে ফিকাহর হাতিয়ারসমূহ) ১৪০০/১৯৮০ সনে সৌদি আরব থেকে গ্রন্থখানি সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়। আরেকজন হাম্বলী গবেষক ইবন আকীল আল-বাগদাদী রচনা করেন আল-ওয়াদিহ্ ফীল-উসূল (উসূল সম্পর্কে স্পষ্ট বিষয়সমূহ)। আবুল-খাত্তাব লিখেছেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আত-তামহীদ (ভূমিকা)। গ্রন্থখানি সম্প্রতি মক্কা থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

মালিকী আইন বিষয়ক চিন্তাধারার গবেষকগণ ঐ সময় যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন সেগুলো হচ্ছে ইবনুল কাসসার আল-বাগদাদী (মৃঃ ৩৯৮ হিঃ) রচিত উয়ুনুল-আদিল্লাহ ফী মাসাইল আল-খিলাফ বাইনা ফুকাহাইল-আমসার (বিভিন্ন এলাকার ফকীহগণের মধ্যে মতভেদপূর্ণ বিষয়ে যুক্তি-প্রমাণের উৎস) উল্লেখযোগ্য। উক্ত গ্রন্থের একখানা কপি ফেজ-এ অবস্থিত কারাবিঈণ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে।[৮] শীরাযীর মতে, মতভেদপূর্ণ বিষয়ে মালিকী গবেষকগণ কর্তৃক লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ। ইবনুল কায়সার মুকাদ্দিমাহ ফী উসূলিল-ফিক্হ (উসূলে ফিকাহ্ সম্পর্কে ভূমিকা) নামে আরেকখানা গ্রন্থ রচনা করেন। এর একখানা কপি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে।

শাফেঈ, হাম্বলী, মালিকী এবং মুতাযিলাপন্থী সকল গ্রন্থের অধ্যায়সমূহ একই রীতিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে এবং একইরূপে বিষয়বস্তু বর্ণনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছে। ফলে এ রীতি 'মুতাকাল্লিমূনের পদ্ধতি' নামে পরিচিতি লাভ করে।

উসূল প্রণয়নে আবু হানিফা (রঃ)-এর অনুসারীগণের ভূমিকা

উসূলে ফিকাহ শাস্ত্রের কোন কোন ইতিহাসবিদ বলেছেন যে, কাজী আবু ইউসুফ এবং মোহাম্মদ ইবনুল-হাসান (রঃ) উসূল (আইনতত্ত্ব) সম্পর্কে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, কিন্তু তাদের এ দাবি প্রমাণিত হয়নি।[৯]

---

৮. দেখুন Brockelmann, appendix II পৃঃ ৯৬৩, নং ৪৯।

৯. দেখুন আল-মক্কী রচিত মানাকিব আল-ইমাম আবু হানিফা, ২খ, ২৪৫; উসূলুস-সারাখসি গ্রন্থের ভূমিকা, ১খ, ৩; কুতুব যাদেহ, মিফাতাহুস-সাআদাহ, ২খ, ৩৭; এবং ইবনুন-নাদিম,

কাশফুয-যুনূন গ্রন্থের রচয়িতা মীযানুল-উসূল (উসূলের মানদণ্ড) গ্রন্থ থেকে উক্ত গ্রন্থের রচয়িতা আলাউদ্দীনের আলোচ্য উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন।[১০]

জেনে রাখা আবশ্যক যে, উসূলে ফিকাহ হচ্ছে উসূলে দীনের একটি শাখাবিশেষ এবং যে কোন গ্রন্থ রচনা করতে গেলে অবশ্যই এর বিষয়বস্তু গ্রন্থকারের নিজের ধারণা ও বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুতরাং উসূলে ফিকাহ-এর অধিকাংশ গ্রন্থকার মুতাযিলাপন্থী, যাদের সাথে আমাদের মৌলিক নীতিগত পার্থক্য রয়েছে, অথবা আহলে হাদীসপন্থী, যাদের সাথে আমাদের ও নীতিগত পার্থক্য না থাকলেও মূল বিষয়ের শাখা-প্রশাখায় গিয়ে মতভেদ রয়েছে। বিশদ বর্ণনার প্রশ্নে আহলে হাদীসের সাথে আমাদের মতভেদ রয়েছে, তাই তাদের কারো গ্রন্থের উপর আমরা নির্ভর করতে পারি না।

আমাদের (হানাফী) গবেষকগণ কর্তৃক প্রণীত গ্রন্থ দুই পর্যায়ের। প্রথম পর্যায়ের গ্রন্থগুলো প্রণীত হয়েছে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে। কারণ গ্রন্থকারগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মূলনীতি ও প্রয়োগ সম্পর্কে ভালভাবে জানতেন। এ ধরনের গ্রন্থের উদাহরণ হচ্ছে : আবু মানসুর আল-মাতুরিদী (মৃত ৩৩৩ হিঃ) রচিত 'মাখাজুশ-শার' (শরীয়ার উৎস) এবং আল-জাদাল (যুক্তি)।

দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রন্থসমূহ প্রণীত হয়েছে খুব যত্নের সাথে শাব্দিক তাৎপর্যের ভিত্তিতে এবং এগুলো বিন্যস্ত করা হয়েছে অত্যন্ত সুন্দরভাবে। গ্রন্থকারগণ তাঁদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সংশ্লিষ্ট বিবরণের বাহ্যিক তাৎপর্যের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা প্রদান এবং সমাধানে পৌছার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁরা নিরংকুশ যুক্তি প্রদর্শনে কিংবা উসূলের সূক্ষ্মতম দিকসমূহ আলোচনায় তেমন একটা দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেননি। ফলে দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রন্থকারগণ কোন কোন ক্ষেত্রে

আল-ফিহরিস্ত। যারা এ দাবি করেছেন তারা সকলে ইবনুস-নাদিম রচিত মুহাম্মদ ইবনুল হাসান-এর জীবনী গ্রন্থের নিম্নোক্ত মন্তব্যের উপর ভিত্তি করেছেন ঃ

"উসূল সম্পর্কিত তাঁর রচিত একখানা গ্রন্থ ছিল, যাতে সালাত, যাকাত ও হজ্জ সম্পর্কে অধ্যায়সমূহ সংযোজিত ছিল।"

এতে বুঝা যায় যে, গ্রন্থখানি ছিল উসূলে দীন বিষয়ে। সম্ভবতঃ উক্ত উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে মূলতঃ ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান রচিত ফিকাহ সম্পর্কিত গ্রন্থ কিতাবুল আসল সম্পর্কে। গ্রন্থখানি সম্প্রতি পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আরো উল্লেখ্য যে, আবু ইউসুফ (রঃ) উসূল সম্পর্কে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন এ কথাটি প্রথম পাওয়া যায় খতিবে বাগদাদ কর্তৃক রচিত "তারিখ বাগদাদ" গ্রন্থের বর্ণনা থেকে। (সম্পাদক)

১০. দেখুন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১০-১১১।

এমন মতামত প্রদান করেছেন, যেগুলোর সাথে আমরা একমত হতে পারি না। যদিও প্রথম পর্যায়ের গ্রন্থসমূহ তাঁদের গুরুত্ব হারিয়েছে হয় দুর্বোধ্যতার কারণে অথবা এরূপ কাজে এগিয়ে আসার ব্যাপারে গবেষকগণের মধ্যে দৃঢ়চিত্ততার অভাবের কারণে।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, উসূল সম্পর্কিত গবেষণা সম্পর্কে উপরোক্ত বিবরণ একজন হানাফী বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রদত্ত হওয়া সত্ত্বেও কত নিখুঁত। এ বিবরণ থেকে উসূলে ফিকাহ-এর বিকাশের ক্ষেত্রে হানাফীগণের ভূমিকা সম্পর্কে অনেকটা বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রাথমিক যুগে, এমনকি ইমাম মাতুরিদীর পূর্বেও এসকল গবেষক তাঁদের যাবতীয় গবেষণা কর্মকে ইমাম শাফেঈ কর্তৃক তাঁর রিসালাহ্ গ্রন্থে উত্থাপিত বিষয়ের পুনরালোচনা করতে কেন্দ্রীভূত রেখেছিলেন। ঈসা ইবন আবান এবং অন্যান্য অনেকে একই পথ অনুসরণ করেছেন।

পরবর্তী যুগে উসূল বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লেখক ছিলেন আবুল হাসান আল-কারখী (মৃঃ ৩৪০ হিঃ)। স্বল্পসংখ্যক পৃষ্ঠা সম্বলিত তাঁর লেখা গ্রন্থখানি আবু যায়দ আদ-দাবূসী প্রণীত তা'সীসুন-নাযার (মতামতের প্রতিষ্ঠা) গ্রন্থের সাথে একত্রে মুদ্রিত হয়। কায়রো থেকে উক্ত গ্রন্থের বেশ কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

আবু বকর আল-জাসসাস (মৃঃ ৩৭০ হিঃ) আল ফুসূল ফীন উসূল নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। মূলতঃ 'আহকামুল-কুরআন' (কুরআনের বিধান) গ্রন্থের ভূমিকা হিসেবে এটি রচিত হয়।[১১] একটি পি.এইচ.ডি. থিসিসের বিষয় হিসেবে আল-ফুসূলের উপর গবেষণা ও সম্পাদনার পর সম্প্রতি তা কুয়েত থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

ইমাম আবু যায়দ আদ-দাবূসীর (মৃঃ ৩৪০ হিঃ) লেখার মাধ্যমেই উসুল বিষয়ে হানাফী সাহিত্যের প্রকৃত বিকাশ শুরু হয়। তিনি দু'টি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন, তার একটি হল তাকবীমুল আদিল্লাহ। এর সম্পূর্ণ অথবা কিছু অংশ সম্পর্কে গবেষণা ও সম্পাদনা করা হলেও এগুলো এখনো মুদ্রিত হয়নি।

---

১১. আল-জাসসাসের প্রধান গবেষণা কর্ম আহকামুল-কুরআন গ্রন্থটি এ সম্পাদকের থিসিসের বিষয়বস্তু হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এটি তৎকর্তৃক ইংরেজি ভাষায় বিস্তারিত টীকাসহ অনুবাদ করা হয়েছে। (সম্পাদক)

অপর গ্রন্থটির নাম তাসীসুন-নাযার।[১২] আবু যায়দ উসূল সম্পর্কিত তাঁর রচনাবলীতে তাঁর পূর্বসূরীগণের, বিশেষত আল-কারখী এবং আল-জাসসাস-এর রচনাবলী থেকে সাহায্য গ্রহণ করেন। তবে পার্থক্য এই যে, তিনি এই বিষয়ের পরিধিকে আরও বিস্তৃত করেন এবং বিস্তৃত পরিসরে ব্যাখ্যা করেন। তিনি হানাফী মতাবলম্বীগণ উসূলের যে সকল বিষয়ে একমত অথবা ভিন্নমত পোষণ করেন সেগুলো সম্পর্কেও সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করেন।

আবূ যায়দকে অনুসরণ করে ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী (মৃঃ ৪৮২ হিঃ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কানযুল-উসূল ইলা মারিফাতিল 'উসূল' (উসূলের জ্ঞানের ভাণ্ডার) রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি উসূল সম্পর্কিত বিষয়াদি সাধারণভাবে আলোচনা করেন। অত:পর হানাফী গবেষকগণ এই গ্রন্থটির ব্যাপারে বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং এর অনেকগুলো সমালোচনা গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে আব্দুল আযিয আল-বুখারী (মৃঃ ৮৩০ হিঃ) রচিত কাশফুল আসরার (গোপন রহস্যভেদ) এ সম্পর্কিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইস্তাম্বুল এবং মিসরে এ সমালোচনা গ্রন্থের বেশ কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

অনুরূপভাবে শামসুল-আইম্মাহ আস-সারাখসী (মৃঃ ৪২৩ হিঃ) রচিত উসূলুস সারাখসী গ্রন্থটি মিসর থেকে দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থটিকে বিভিন্ন দিক থেকে আদ-দাবূসীর রচিত 'তাকবীমুল-আদিল্লাহ' গ্রন্থের বিকল্প পাঠ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। উসূলের হানাফী গবেষকগণ আল-বাযদাবী এবং আল সারাখসী রচিত গ্রন্থাবলীর ব্যাপারে সবিশেষ আগ্রহী ছিলেন এবং এগুলোর শিক্ষা দান এবং এগুলোর পর্যালোচনা দীর্ঘকাল যাবত চলতে থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে এটা নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়েছে যে, জ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা হিসেবে উসূলে ফিকাহর বিকাশ পঞ্চম হিজরী শতাব্দীতে সম্পূর্ণতা লাভ করে এবং এ বিষয়ে পরিধি নির্ণয় ও তাত্ত্বিক পরিভাষাসমূহের সংজ্ঞা প্রদানের কাজ সম্পন্ন হয়। বস্তুত ঐ শতাব্দীর মধ্যে প্রায় সকল আইন বিষয়ের চিন্তাধারার গবেষকগণ উসূলে ফিকাহ সম্পর্কে তাঁদের নিজ নিজ ব্যাখ্যা ও উপলব্ধিসমূহের লিপিবদ্ধ রূপ দিতে সক্ষম হন।

---

১২. তাকবীমুল-আদিল্লাহ দশ খণ্ডে সম্পাদনার কাজ সমাপ্ত হয়েছে, ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। (সম্পাদিক)

শাফেঈগণ অথবা মুতাকাল্লিমূন এবং হানাফীগণের অনুসৃত পদ্ধতি

উসূল সম্পর্কিত যে কোন রচনায় সাধারণতঃ নিম্নোক্ত দু'টি পদ্ধতির যে কোন একটি অনুসরণ করা হয়। প্রথমটি হচ্ছে শাফেঈ পদ্ধতি বা মুতাকাল্লিমূনের পদ্ধতি। এই পদ্ধতিটি শাফেঈ, মালিকী, হাম্বলী এবং মুতাযিলীগণ কর্তৃক অনুসৃত হয়েছে।[১৩] এ পদ্ধতি মুতাকাল্লিমূন পদ্ধতি নামে পরিচিত। কারণ এই পদ্ধতির অনুসারী লেখকগণ তাঁদের গ্রন্থে ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের বিভিন্ন বিষয়ের পণ্ডিত হিসেবে পরিচিত ছিলেন। যেমন– তাঁদের আলোচ্য বিষয় ছিল 'হাসান' এবং 'কাবীহ' (ভাল এবং নিন্দনীয়), হুকমুল-আশয়া কাবলাশ-শার (শরীয়াহ নাযিল হওয়ার পূর্ববর্তী বিষয়সমূহের আইনগত মর্যাদা), শোকরুল মুনইম (নিয়ামত দানকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা) এবং আল-হাকীম (সার্বভৌমত্বের মালিক) ইত্যাদি। উক্ত পদ্ধতি মুতাকাল্লিমূন পদ্ধতি হিসেবে পরিচিতি লাভের আর একটি কারণ এই যে, তাঁরা উসূলের আইনতত্ত্বের নীতিমালাসমূহের সংজ্ঞা প্রদানকালে অবরোহ পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন এবং এ সকল নীতিমালার বৈধতা নিশ্চিত করেছেন ও বিপক্ষের মতামত খণ্ডন করেছেন। তাঁরা এ সকল নীতিমালা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ও তৎপ্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের প্রতি তেমন মনোযোগ দেননি।

হানাফীগণের উসূল সম্পর্কিত পদ্ধতি

হানাফী পদ্ধতির রচনাসমূহ আইনগত বিষয়ের বিশদ বিবরণ থেকে উসূলের মুলনীতিসমূহের সংজ্ঞা প্রদানে ব্যাপৃত হয়। তাদের পূর্বসূরী গবেষকগণও একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। মূলতঃ ইতোপূর্বে নিষ্পত্তিকৃত আইনগত বিষয়ের বিশদ বিবরণীর উপর ভিত্তি করে তাঁদের গবেষণাসমূহ সম্পাদিত হয়েছে, এর বাইরে নয়। অতএব এ পদ্ধতিতে যদি কেউ উসূলে ফিকাহ সম্পর্কে গবেষণা করতে চান তাহলে তিনি এমন সব বিষয় বিস্তারিতভাবে সংগ্রহ করবেন যে সম্পর্কে হানাফী ইমামগণ ইতোমধ্যেই ফতোয়া প্রদান করেছেন। অত:পর সংগৃহীত তথ্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে, কিসের ভিত্তিতে এ সকল ফতোয়া প্রদান করা হয়েছিল।

---

১৩. এ সকল ভিন্ন ভিন্ন দলের গবেষকগণ তাঁদের গ্রন্থে কিছু না কিছু সংযোজন করেছেন, যদিও তাঁরা লিখেছেন একই ধাঁচে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ ও যুক্তিসমূহ উপস্থাপন করেছেন একই পদ্ধতিতে।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রঃ) মন্তব্য করেছেন, "আমি দেখেছি তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ দাবি করেন যে, আল-বাযদাবী রচিত গ্রন্থে এবং অন্যত্র তাঁরা উসূলের ব্যাপারে আবু হানিফা ও শাফেঈ (রঃ)-এর মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ সকল উসূল উদ্ভূত হয়েছে আইনগত বিষয়ে ইমামগণের মতপার্থক্য থেকে। এ বিষয়ে আমার অভিমত হলোঃ উসূলের এরূপ মূলনীতি যেগুলোতে বিশেষ বিশেষ (খাস) বিষয়গুলো সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে (মুবাইয়্যান) এবং যার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই; অতিরিক্ত কিছু যুক্ত করা হলে তা রহিত (নাসখ) হয়ে যায়। ব্যাপকার্থে বর্ণিত সাধারণ বিষয়াদি (আম) বিশেষ (খাস) বিষয়াদির মত চূড়ান্ত (কাতঈ); নিছক বর্ণনার আধিক্য একটি মত থেকে অন্য মতের অগ্রাধিকার (তারজীহ) নির্ণায়ক হতে পারে না; যুক্তির আশ্রয় নেয়ার কোন সুযোগ না থাকলে ফকীহ নন এমন কোন লোকের বর্ণিত হাদীস গ্রহণের আবশ্যকতা নেই; কোন পূর্বশর্ত বা বর্ণনা (ওয়াসফ) থেকে আইনগত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ধারণার কোন বৈধতা নেই; মূল বিবরণের যে কোন অনুজ্ঞা (আমর) আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক (উজূব); ইত্যাদি মূলনীতির উদাহরণগুলো গঠিত হয়েছে ইমামগণ প্রদত্ত রায় থেকে।

বস্তুত এমন কোন স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়নি যার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, আবু হানিফা (রঃ) বা তাঁর দু'জন অনুসারী যথাক্রমে ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) উসূলের উপরোক্ত কোন মূলনীতি অনুসরণ করেছেন। তাহলে কি এ সকল মূলনীতি সংরক্ষণ করা বা এগুলোর পক্ষাবলম্বন করার আর কোন প্রয়োজন নেই, আল-বাযদাবী এবং অন্যান্যরা যেমন করেছেন? তাহলে তো এর বিপরীত নীতিমালাগুলোই কার্যকর হয়।"[১৪]

ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দী ও তৎপরবর্তী কালের উসূলে ফিকাহ্

মুতাকাল্লিমূন পদ্ধতি অনুসারে জ্ঞানের এ বিশেষ শাখার আলোচ্য বিষয়সমূহ চারটি প্রধান গ্রন্থে একটি সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। উক্ত চারখানি গ্রন্থের নাম হলো আল-আহ্দ, আল-মু'তামাদ, আল-বুরহান এবং আল-মুস্তাসফা। দু'জন মহান মুতাকাল্লিম গবেষক উক্ত চারটি গ্রন্থের সারসংক্ষেপ গ্রন্থ রচনা করেন।

---

১৪. দেখুন, দেহলভী প্রাগুক্ত ১খ, ৩৩৬-৩৪১; আরো দেখুন দেহলভী রচিত আল-ইনসাফ ফী বায়ান আসবাব আল-ইখতিলাফ (সালাফিয়াহ্, কায়রো), পৃঃ ৩৮-৪০।

প্রথমজন হলেন ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (মৃঃ ৬০৬ হিঃ)। তিনি উল্লেখিত গ্রন্থ চতুষ্টয়ের সারসংক্ষেপ নিয়ে আল-মাহসূল (সারসংক্ষেপ) গ্রন্থখানি রচনা করেন। আমার উক্ত গ্রন্থখানি সম্পাদনা এবং এর উপর গবেষণা করার সৌভাগ্য হয়েছে, যা ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সাউদ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ছয় খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে এবং বর্তমানে তা পুনঃমুদ্রণের কাজ চলছে।

দ্বিতীয়জন হলেন ইমাম সাইফুদ্দিন আল-আমিদী (মৃঃ ৬৩১ হিঃ) তিনি উক্ত চারখানি গ্রন্থের সারসংক্ষেপ নিয়ে 'আল-ইহকাম ফী উসূল আল-আহকাম (আইন বিষয়ক উসূলের বিশুদ্ধতা) রচনা করেন, যা রিয়াদ, কায়রো এবং অন্যান্য স্থান থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

এই গ্রন্থ দু'খানি বৃহত্তম এবং তুলনামূলকভাবে সহজপাঠ্য ও অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় সহজবোধ্য। এই দুটির মধ্যে আল-মাহসূল লেখা হয়েছে সহজতর ভাষায় এবং বেশ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই দু'টি গ্রন্থে বহু টীকা ও মন্তব্য লেখা হয়েছে। তাজুদ্দীন আল-আরমাবী (মৃঃ ৬৫৬ হি) আল-মাহসূল গ্রন্থের সারসংক্ষেপ করেন তাঁর আল-হাসিল (ফলাফল) গ্রন্থখানিতে। তা আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি. থিসিস হিসেবে গবেষণা করা হয়েছে এবং সম্পাদনা করা হয়েছে। অবশ্য তা এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

ইমাম আল-রাযী (রঃ) নিজেও আল-মুনতাখাব (নির্বাচিত) নামক একখানা গ্রন্থে আল-মাহসূলের সারসংক্ষেপ করেছেন, যার উপর জনৈক গবেষক কর্তৃক গবেষণা ও সম্পাদনা কার্য সম্পন্ন হয়েছে।

কাযী আল-বাযদাবী (মৃঃ ৬৮৫ হিঃ) আল-হাসিল গ্রন্থের সারসংক্ষেপ করেন মিনহাযুল-ওয়াসুল ইলা ইলমিল-উসূল (উসূল শাস্ত্রের উপর কর্তৃত্ব করার উপায়) নামক গ্রন্থে। কিন্তু তাঁর রচিত সারসংক্ষেপ এতোই সংক্ষিপ্ত হয়েছে যে, এটাকে অনেকটা হেঁয়ালী বলে মনে হয় এবং বুঝা খুবই কষ্টকর। তাই বহু গবেষক এই গ্রন্থের উপরে সমালোচনা লেখার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এরূপ সমালোচনা গ্রন্থের মধ্যে আল-ইসনাবীর (মৃঃ ৭৭২ হিঃ) গ্রন্থখানিকে শ্রেষ্ঠ বলা যায়। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম নিহায়াতুসসুউল (প্রশ্নের সমাপ্তি)। এই গ্রন্থখানি দীর্ঘকাল যাবত উসূল গবেষকগণের মনোযোগ আকৃষ্ট করে রাখে এবং আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শরীয়াহ গবেষকগণ এখনও এই গ্রন্থের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

আল-আমিদী রচিত আল-ইহকাম (বিশুদ্ধকরণ) গ্রন্থের সারসংক্ষেপের ভিত্তিতে মালিকী মাযহাবের অনুসারী ইবনুল-হাজিব (মৃঃ ৬৪৬ হিঃ) মুনতাহাস-সুউল

ওয়াল-আমাল ফী ইলমিল উসূল ওয়াল জাদাল (আইনতত্ত্ব ও যুক্তিবিদ্যার চূড়ান্ত কথা) নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। ইমাম মালিক (রঃ)-এর অনুসারীগণের নিকট এই গ্রন্থখানি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।

এই গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে রচিত যে সকল সমালোচনা গ্রন্থ পাওয়া যায় তন্মধ্যে আদুদুদ্দীন (মৃঃ ৭৫৬ হিঃ) রচিত গ্রন্থ শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত, যাতে বেশ কিছু টীকা ও মন্তব্য লিখিত হয়েছে।

উপরে উল্লেখিত সব কয়টি গ্রন্থ মুতাকাল্লিমূনের পদ্ধতি অনুসরণে লিখিত হয়েছিল মূলনীতিসমূহের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছিল, যুক্তি-প্রমাণ দাঁড় করানো হয়েছিল এবং যারা ভিন্নমত পোষণ করতঃ তাদের যুক্তি খণ্ডন করার চেষ্টা করা হয়েছে ঐ গুলোরই ভিত্তিতে। এ প্রক্রিয়া দুটি দলের একটির পরাজয় না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে। উসূলের হানাফী গবেষকগণ অনুরূপভাবে আল-বাযদাবী এবং আস-সারাখসী রচিত গ্রন্থসমূহের উপর গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন।

৬ষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর শেষে এবং সপ্তম হিজরী শতাব্দীর সূচনাকালে উসূলের গবেষকগণ কর্তৃক নতুন পদ্ধতির সূচনা না হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে। এই নতুন পদ্ধতিতে মুতাকাল্লিমূন এবং হানাফী পণ্ডিতদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এমন গ্রন্থ রচনা করা যাতে উভয় দলের উসূল সমন্বিত হয়। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে মুযাফফারুদ দীন আস-সাআতী (মৃঃ ৬৯৪ হিঃ) কর্তৃক 'বাদীউন নিযামিল জামি বাইনা কিতাবায় আল-বাযদাবী ওয়া ইহকাম গ্রন্থখানি রচিত হয়। ইহা একখানি মুদ্রিত ও সহজলভ্য গ্রন্থ। সদরুশ-শরীয়াহ (মৃঃ ৭৪৭ হিঃ) তাঁর তানকীহুল উসূল (আইনতত্ত্বের পরিমার্জন) গ্রন্থে বাযদাবীর 'আল-মাহ্সূল' এবং ইবনুল হাজিবের 'মুখতাসার' গ্রন্থদ্বয়ের সারসংক্ষেপ পেশ করেন। অতপর তিনি তাঁর গ্রন্থের উপর 'আত-তাওদীহ্' (ব্যাখ্যা) নামে একখানা ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন। আত-তাফতাযানী (মৃঃ ৭৯২ হিঃ) 'আত-তালবীহ' নামে উক্ত গ্রন্থের পার্শ্বটীকা রচনা করেন। উপরোক্ত তিনটি গ্রন্থই সহজলভ্য।

শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী গবেষকগণের মধ্যে তাজুদ্দীন আস-সুবকী রচিত জুম'উল জাওয়ামি (সংকলনসমূহের সংকলন) গ্রন্থখানি বিখ্যাত। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেছেন যে, প্রায় শ'খানেক ুসূল বিষয়ক গ্রন্থ থেকে সংকলিত করে তিনি এই গ্রন্থখানি রচনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বহুল ব্যবহৃত সমালোচনা গ্রন্থ হচ্ছে শারহুল জালাল

৬ষ্ঠ অধ্যায়

ইজতিহাদ সম্পর্কে আলোচনা

ঐতিহ্যগতভাবে উসূল সম্পর্কিত যে কোন গ্রন্থের পূর্ণ এক অধ্যায় জুড়ে থাকে ইজতিহাদ সম্পর্কিত আলোচনা। সে অধ্যায়ে গ্রন্থকার প্রথমত ইজতিহাদের সংজ্ঞা, এর বৈধতা সম্পর্কিত শর্তাবলী এবং বিভিন্ন প্রকারের ইজতিহাদের পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করেন। অত:পর গ্রন্থকার রাসূল (সা:) ইজতিহাদকে এক ধরনের ইবাদত হিসেবে বিবেচনা করতেন কি না কিংবা রাসূল (স:)-এর জীবদ্দশায় ইজতিহাদ সাহাবীগণের জন্য ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়েছিল কি না, যে কোন বিষয়ে ইজতিহাদের ফলাফল হিসেবে শুধুমাত্র একটি উত্তরই সঠিক হবে নাকি একাধিক সঠিক উত্তর হতে পারে এবং ইজতিহাদের অনুমতি ছিল কি না ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে থাকেন। এরপর গবেষকগণ তাকলীদ বিষয়েও একইভাবে আলোচনা করে থাকেন।

অষ্টম হিজরী শতাব্দীতে ইবরাহীম ইবন মূসা আশ-শাতিবী (মৃ: ৭৯০ হি:) আল-মুআফাকাত (সামঞ্জস্য) নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি ইজতিহাদকে দুটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলনের বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেন। এর প্রথম স্তম্ভ হলো আরবী ভাষার ব্যাকরণ ও পদপ্রকরণ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান। তিনি এই বিষয়কে আরবী ভাষাবিদ ও অন্যান্য উসূলের লেখকগণের উপর ছেড়ে দেন। শাতিবীর মতে ইজতিহাদের দ্বিতীয় স্তম্ভ হলো সর্বজ্ঞানী আইনদাতা (আল্লাহ তায়ালা) কর্তৃক প্রদত্ত বিধি-বিধানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞান।

আশ-শাতিবীর পূর্বসূরীগণ উসূলের এ দিকটির প্রতি তত বেশি গুরুত্ব প্রদান করেননি। বরং তাঁদের অনেকেই উল্লেখিত দৃষ্টিকোণ থেকে ইল্লাত (কারণ)-এর মূল তত্ত্ব অনুসন্ধানে নিয়োজিত ছিলেন। অপরপক্ষে আশ-শাতিবী এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর গ্রন্থ রচনা করেন। বস্তুত: মহান আইনদাতা কর্তৃক প্রদত্ত বিধি-

আল-মুহাল্লা। আজও গ্রন্থখানি বিশেষ করে শাফেঈ গবেষকগণের নিকট উসূল সম্পর্কিত গবেষণার ভিত্তি হিসেবে সমাদৃত।

বাদরুদ্দীন আয-যারকাশী (মৃঃ ৭৯৮ হিঃ) তাশনীফুল মাসামি (কানকে খুশী করা) নামে একখানা সমালোচনা গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থের অংশ বিশেষ শায়খ আল-মুতীঈ (মৃঃ ১৩৫৪ হিঃ) কর্তৃক কায়রো থেকে পাদটীকাসহ মুদ্রিত হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র তাঁর পি.এইচ.ডি. থিসিসের অংশ হিসেবে উক্ত গ্রন্থের উপর গবেষণা করেছেন এবং অংশবিশেষ সম্পাদনা করেছেন।

আয-যারকাশী কর্তৃক আল-বাহরুল-মুহীত (বিশাল সমুদ্র) নামে আরেকখানা গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এতে তিনি শতাধিক গ্রন্থ থেকে উসূল গবেষকগণের অবদান সংগ্রহ করেছেন। আমাদের তত্ত্বাবধানে একজন ছাত্র তাঁর পি.এইচ.ডি থিসিসের অংশ হিসেবে এ গ্রন্থের উপর গবেষণা ও সম্পাদনার কাজ শুরু করেছেন। ইতোমধ্যে এর একটি খণ্ডের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং তা প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

হাম্বলী মাযহাবের গবেষকগণের মধ্যে ইবন কুদামাহ (মৃঃ ৬২০ হিঃ) রচিত 'রওদাতুন-নাযির ওয়া জান্নাতুল-মানাযির' উল্লেখযোগ্য। উক্ত গ্রন্থে তিনি আল-গাযযালী রচিত 'আল মুস্তাসফা' গ্রন্থের সারসংক্ষেপ ছাড়াও যে সকল বিষয়ে হানাবিলাগণ অন্যান্যদের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন সে সকলের উল্লেখসহ কিছু প্রয়োজনীয় বিষয়ও সংযোজন করেন। উক্ত গ্রন্থখানি বহুবার মুদ্রিত হয়েছে এবং হানাবিলাগণ এ গ্রন্থের উপর এতোটুকু গুরুত্বারোপ করেন যে, তাঁরা এ বিষয়ে অন্যান্য সকল গ্রন্থকে প্রায় উপেক্ষা করেন। সুলায়মান আত-তূসী (মৃঃ ৭১৬ হিঃ) গ্রন্থখানিকে সংক্ষেপিত করেন এবং দু'খণ্ডে এর উপর মন্তব্য লেখেন।

মালিকীগণের মধ্যে আল-কাররাফী (মৃঃ ৬৮৪ হিঃ) রচিত তানকীহুল-ফুসূল ফী ইখতিসারিল-মাহ্সূল (আল-মাহ্সূল–এর সারাংশ প্রণয়নে কিছু পরিশীলিত অধ্যায়) উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আল-কারাফী 'আল-মাহসূলের' উপর বৃহদাকারের একটি সমালোচনা গ্রন্থ রচনা করেছেন। উক্ত গ্রন্থের নাম নাফাইসুল-উসূল (উসূলের ভাণ্ডার), যার অংশবিশেষের উপর আমাদের তত্ত্বাবধানে রিয়াদে গবেষণা ও সম্পাদনার কাজ চলছে।

বিধানসমূহ অনুধাবন করার জন্য তথা শরীয়াহ-এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক এখনো উসূল গবেষকগণ উক্ত গ্রন্থের প্রতি মনোযোগ প্রদান করেননি। এটা সম্ভবত এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, বহু গবেষকের মনে একটি বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত বিধি-বিধানসমূহের কারণ খোঁজার অনুমতি নেই এবং এ বিষয়ে কোনরূপ আন্দাজ-অনুমানকে সুশৃঙ্খল করা বা সেগুলোর সুনির্দিষ্ট রূপদান করা যেতে পারে না।[১] যখন ব্যাপারটি এরূপ কিংবা বহু গবেষক এভাবে তাঁদের যুক্তি উপস্থাপন করতে থাকেন, তখন এরূপ একটি বিষয়ে গবেষণা করতে যাওয়া নেহায়েত বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাসিতা ছাড়া আর কিছু নয়।

যাই হোক, আশ-শাতিবীর উক্ত গ্রন্থখানি সহজলভ্য আমরা আশা করবো, উসূলের শিক্ষকগণ এবং যাঁরা পাঠ্যসূচি প্রণয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত তাঁরা তাঁদের ছাত্রদেরকে, বিশেষত যারা 'কিয়াস, তালীল ও ইজতিহাদ অধ্যয়ন করছেন তাদেরকে এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করবেন। আমাদের সময়ের দু'জন মহান গবেষক যথাক্রমে ইবন আশূর এবং আল্লাল আল-ফাসী শরীয়াহর উদ্দেশ্য সম্পর্কে দু'টি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

ইবন হুমাম (মৃঃ ৮৬১ হিঃ) আত-তাহরীর (গ্রন্থ প্রণয়ন) নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর একজন ছাত্র ইবন আমীর আল-হাজ্ব (মৃঃ ৮৭৯ হিঃ) উক্ত গ্রন্থের উপরে 'আত-তাকরীর ওয়াত-তাহরীর নামে একখানা সমালোচনা গ্রন্থ রচনা করেন। উভয় গ্রন্থই মুদ্রিতাকারে পাওয়া যায়। আত-তাহরীর এমন একখানা গ্রন্থ যা হানাফী ও মুতাকাল্লিমূন এ উভয় চিন্তাধারার সমন্বয়ে প্রণীত হয়েছে। এছাড়া আমীর বাদশাহ রচিত তায়সীরুত-তাহরীর (গ্রন্থ প্রণয়ন সহজীকরণ) নামে একখানা সমালোচনা গ্রন্থ পাওয়া যায়।

আল-কাজী আলাউদ্দীন আল-মারদাবী (মৃঃ ৮৫৫ হিঃ) ইবন মুফলিহ[২] (মৃঃ ৭৬৩ হিঃ)-এর প্রসিদ্ধ উসূল গ্রন্থের একখানা সমালোচনা গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থের নাম তাহরীরুল-মানকূল ওয়া তাহজীব ইলমিল-উসূল। উক্ত গ্রন্থখানি

---

১. আরেকটি কারণ হতে পারে সর্বশক্তিমান কথাটির প্রায়োগিক তাৎপর্য সম্পর্কে বিকল্প অনুমান করা। (সম্পাদক)

২. উক্ত গ্রন্থের অংশবিশেষ জনৈক ছাত্র তার স্নাতকোত্তর থিসিস হিসেবে সম্পাদনা করেছেন এবং পি.এইচ.ডি থিসিসের অংশ হিসেবে বাদবাকি অংশের সম্পাদনা করেছেন।

সম্প্রতি গবেষণা এবং সম্পাদনা করা হয়েছে এবং শীঘ্রই তা প্রকাশিত হওয়ার কথা। একই গবেষক উসূল ইবন মুফলিহ-এর উপরও কাজ করছেন।

পরবর্তীকালে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ইবনুন-নাজ্জার আল-ফুতূহী তাহরীরুল মারদাবী গ্রন্থের সারসংক্ষেপ রচনা করেন এবং উক্ত গ্রন্থের উপর উন্নত মানের টীকা প্রণয়ন করেন। তাঁর প্রণীত এ টীকাগ্রন্থকে উসূল বিষয়ে পরবর্তীকালে রচিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং সবচাইতে গবেষণাধর্মী গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। স্বনামধন্য অধ্যাপক ড. নাযিহ হাম্মাদ এবং ড. মুহাম্মদ আয-যুহাইলী কর্তৃক গ্রন্থখানির উপর গবেষণা এবং সম্পাদনা করার পূর্বে এর একটি অসম্পূর্ণ সংস্করণ কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁদের উক্ত গবেষণাকর্ম মক্কার কলেজ অব শরীয়াহর একাডেমিক রিসার্চ সেন্টার থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বাদশ হিজরী শতাব্দীতে হানাফী মাযহাবের অনুসারী মুহিব্বুল্লাহ ইবন আবদুস শাকুর আল-বিহারী (মৃঃ ১১১৯ হিঃ) তাঁর বিখ্যাত উসূল বিষয়ক গ্রন্থ 'মুসাল্লামুস-ছুবূত' রচনা করেন। পরবর্তী যুগে হানাফী গবেষণাধর্মী গবেষকগণ কর্তৃক রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে এটি সবচেয়ে বস্তুনিষ্ঠ ও গবেষণাধর্মী গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। গ্রন্থখানি ভারতে মূলের সাথে টীকাসহ মুদ্রিত হয়েছে। এছাড়া বিখ্যাত টীকা গ্রন্থ ফাওয়াতিহুর রাহমুত-এর পার্শ্বটীকায় ইমাম গাযযালী রচিত আল-মুস্তাসফাসহ বেশ কয়েকবার তা মুদ্রিত হয়েছে।

এ সকল গ্রন্থ উপরে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে। সকল গ্রন্থের লেখকদের নিজ নিজ মাযহাবকে সমর্থন করে যাবতীয় আলোচনা কেন্দ্রীভূত হয়েছে এবং প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করা হয়েছে।

আশ-শায়খ মুস্তফা আবদুর রাজ্জাক কর্তৃক গ্রন্থ 'তামহীদ লিতারীখ আল-ফালসাফা আল-ইসলামিয়া' (ইসলামী দর্শনের ইতিহাসের ভূমিকা নামক গ্রন্থে প্রদত্ত প্রাসঙ্গিক একটি মন্তব্য প্রদান করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মুসলিম বিচারকগণকে ইজতিহাদ সংক্রান্ত ভুল থেকে রক্ষা করার হাতিয়ার হতে পারে, উসূলে ফিকাহ সংক্রান্ত এরূপ একটি গবেষণা গ্রন্থও পাওয়া যাবে না। আশ-শায়খ মুস্তফা আবদুর রাজ্জাকের উক্ত মন্তব্য তাঁর ছাত্র ড. নাশশার রচিত 'মানহিজ আল-বাহছ' (গবেষণা পদ্ধতি) গ্রন্থে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ত্রয়োদশ হিজরী শতাব্দীতে কাযী আশ-শাওকানী (মৃঃ ১২৫৫ হিঃ) উসূল সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ইরশাদুল-ফুহুল (শ্রেষ্ঠজনের পথনির্দেশ) রচনা করেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে উসূল বিষয়ে বিভিন্ন মত এবং প্রতিটি মতের প্রবক্তাগণ কর্তৃক প্রদত্ত প্রমাণসমূহ সংক্ষেপে অথচ অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। গ্রন্থকার কোন্ মতটি পছন্দ করেন তাও তিনি উক্ত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থখানি বহুবার মুদ্রিত হয়েছে এবং উসূলে ফিকাহ ও আইন শাস্ত্রের তুলনামূলক অধ্যয়নে ছাত্রদের জন্য এটি খুবই সহায়ক। যাই হোক, আমাদের জানামতে গ্রন্থখানি গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও কোন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাসূচিতে এটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

মুহাম্মদ ছিদ্দিক খান (মৃঃ ১৩০৭) উক্ত গ্রন্থের সারসংক্ষেপের ভিত্তিতে 'হুসূল আল-মামূল মিন ইলমিল-উসূল' (উসূল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক উদ্যোগ) নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থখানি মুদ্রণাধীন।

বস্তুতঃ ইরশাদুল-ফুহুল-কে আল-যারকাশী রচিত আল-বাহরুল-মুহীত গ্রন্থের নির্ভুল সারসংক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া আল-মুহাল্লাবী রচিত 'তাসহীলুল-উসূল' গ্রন্থকেও ইরশাদুল ফুহুল গ্রন্থের সারসংক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

এর পরবর্তী যুগের উসূল সম্পর্কিত গবেষণায় আমরা নিম্নবর্ণিত যে কোন দুইটি ধারার একটিকে অনুসৃত হতে দেখি–

১. গবেষণা সম্পর্কিত নির্দেশিকা, সারসংক্ষেপ ও টীকা-টিপ্পনী লিখন। বিভিন্ন শরীয়াহ ও আইন কলেজের অধ্যাপকগণ যখন বুঝলেন যে, তাঁদের ছাত্ররা বিষয়টি ঠিকভাবে বুঝতে পারছে না বা এ বিষয়টি অধ্যয়নে অনাগ্রহ প্রকাশ করছে তখন তাঁরা তাঁদের উসূলে ফিকাহের ছাত্রদের অধ্যয়নকে সহজতর করার জন্য উল্লেখিত কাজগুলো সম্পাদনা করেন। এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এ সকল টীকা-টিপ্পনী দ্বারা জ্ঞানের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলো ছিল নিছক আধুনিক ভাষারীতি অনুসারে সহজ পদ্ধতিতে উসূলে ফিকাহর বিভিন্ন বিষয়কে পুনর্বিন্যস্তকরণ মাত্র। নিম্নবর্ণিত গবেষকগণের লেখা গ্রন্থগুলো ছিল মূলতঃ আইন ও শরীয়াহ কলেজে তাঁদের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তৃতা। তাঁরা হলেন আল-মারসাফী, আল-মুহাল্লাবী, আল-খুদারী, আবদুল

ওয়াহ্হব খাল্লাফ, আশ-শিনকীতি, আল-সাইস, মুস্তফা আবদুল খালিক, আবদুল গণি আবদুল খালিক, আবু যাহরাহ্, আবুন নূর যুহাইর, মারুফ আদ-দাওয়ালীবী, আবদুল কারীম যায়দান, যাকীউদ-দীন, শা'বান, মোহাম্মদ সাল্লাম মাদকুর ও অন্যান্য অনেকে।

২. দ্বিতীয় ধারায় লক্ষ্য করা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এই বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে থিসিস লেখা, গবেষণা করা এবং অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিসমূহ সম্পাদনা করা হচ্ছে। নিঃসন্দেহে এ দুটি ধারাই যথেষ্ট ফলদায়ক হয়েছে এবং এর কোন একটিকে অবমূল্যায়ন করার ইচ্ছা আমার নেই। তবে এর কোনটিকে জ্ঞানের এ ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে বলে বিবেচনা করা যায় না। ফলে উসূলে ফিকাহ ৬ষ্ঠ হিজরী শতাব্দীতে আমাদের পূর্বসূরীগণ যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিলেন তা ঠিক সেই অবস্থায় রয়ে গেছে। উপরের আলোচনা থেকে আমরা এই উপসংহারে আসতে পারি :

ক. রাসূল (সাঃ) বা তাঁর সাহাবীগণের যুগে সুনির্দিষ্ট কতগুলো পরিভাষাসহ আজকের দিনে উসূলে ফিকাহ নামে পরিচিত জ্ঞানের এ শাখাটির উদ্ভব ঘটে নি। এ দু'টি যুগে যে সকল বিভিন্ন ইজতিহাদ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে অধিকাংশকেই বর্তমান উসূলের নির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। এর কারণ হচ্ছে তাঁরা কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে আইনের মূল উৎসসমূহের ভিত্তিতে তাঁদের স্বভাবজাত বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন, ঠিক যেমন সহজাতভাবে আরবী ভাষায় তাঁরা কথা বলতেন, তাঁরা সচেতনভাবে বৈয়ারকরণিক নিয়ম-কানুন অনুসরণ করতেন না। এ সকল নিয়ম-কানুন তখনকার সময়ে ছিল অজ্ঞাত।

খ. উসূলে ফিকাহ (আইনতত্ত্ব) সম্পর্কিত গ্রন্থ সর্বপ্রথম যে গবেষক রচনা করেন তিনি হলেন ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইদরীস আশ-শাফেঈ (রঃ) (১৫০-২০৪ হিঃ)।

রিসালাহ হলো তুলনামূলক বিশ্লেষণসহ বিস্তৃতভাবে প্রণীত উসূল বিষয়ক সর্বপ্রথম গ্রন্থ। ইমাম আবদুর রহমান ইবনুল মাহদী (১৩৫-১৯৮ হিঃ)-এর অনুরোধে তিনি উক্ত গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন। ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (রঃ) (৯৩-১৭৯ হিঃ)-এর নেতৃত্ব আহলে হাদীস চিন্তাধারা এবং ইমাম আবু হানিফা (রঃ) (৭০-১৫০ হিঃ)-এর নেতৃত্বে আহলে রায় চিন্তাধারা, ফিকাহ শাস্ত্রে এ দু'টি বিখ্যাত চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠা ও বিস্তৃতি ঘটার পর তিনি উল্লেখিত গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেছিলেন।

উল্লেখিত দু'টি আইন বিষয়ক চিন্তাধারার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটার ফলে দু'টি চিন্তাধারার অনুসারীগণের মধ্যে সমকালীন রাজনৈতিক, ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক মতবিরোধ সৃষ্টি হয় যাকে বলা যেতে পারে ফিকাহ সংক্রান্ত মতবিরোধ।[৩]

গ. বিচারকগণের[৪] নিকট উসূলে ফিকাহ হচ্ছে একটি গবেষণা পদ্ধতি এবং ফিকাহ শাস্ত্রে এর অবস্থান দর্শনশাস্ত্রে তর্কবিদ্যার অবস্থানের সাথে তুলনীয়।[৫]

সুতরাং এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে এভাবে : "যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে সামগ্রিকভাবে ফিকাহ্ শাস্ত্রের সকল শাখা সম্পর্কে এবং তার অনুকূলে প্রদত্ত দলীল-প্রমাণ, তার (দলীল-প্রমাণের) অবস্থা ও তা পেশের পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায় তাকে উসূলে ফিকাহ বলে।"[৬]

সুতরাং উসূলে ফিকাহ মুজতাহিদগণকে এমন একটি বিস্তৃত পথনির্দেশনা দান করে, যা তাদেরকে আইনগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত উপাদানসমূহের ব্যবহার কালে বিভিন্ন প্রকারে সম্ভাব্য ভুল থেকে রক্ষা করে।[৭] যদিও ইমাম শাফেঈ (রঃ) কর্তৃক নতুন ফিকাহ শাস্ত্রে ব্যবহার না করা পর্যন্ত তা উক্তরূপে ব্যবহৃত হয়নি।[৮]

ঘ. একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে যে, উসূল সম্পর্কে কেউ কিছু বলার আগে থেকেই গবেষকগণ ফিকাহ সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছেন এবং সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। (ইমাম শাফেঈর 'নতুন ফিকাহ' এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম)। সুতরাং অন্যরা উসূলে ফিকাহর ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করেছেন তাহলো, নেহায়েত কোন

---

৩. দেখুন ইবন খালদুন, আল-মুকাদ্দিমা, ৩খ, ১১৬৩-৬৪।

৪. আল-নাশশার, মানাহিজুল বাহছ, পৃঃ ৫৫।

৫. দেখুন মুসাল্লামুস ছুবূত এবং আল-গাযযালী রচিত আল-মুস্তাসফা-এর টীকা, ১খ, ৯-১০। এই লেখক তর্কবিদ্যা সম্পর্কে এ ধারণার বিরোধিতা করেন। যেমন দাবি করা হয়েছে যে, দর্শন শাস্ত্র এবং উসূলে ফিকাহ এ উভয় ক্ষেত্রে তর্কবিদ্যার অবস্থান এক। সম্ভবতঃ তিনি তর্কবিদ্যা সকল বিজ্ঞানের মানদণ্ড- এ ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

৬. দেখুন এ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়।

৭. দেখুন আল-রাজী, মানাকিব আল-শাফেঈ, পৃঃ ৯৮ এবং আন-নাশশার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫।

৮. ইমাম শাফেঈ মিসরে বসবাস করার পর হতে তাঁর আইন বিষয়ক রচনাবলীকে নতুন ফিকাহ নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এটা নিশ্চয়ই মালিকী এবং হানাফী আইন বিষয়ক চিন্তাধারার উপর দীর্ঘকাল অধ্যয়নের ফলে তাঁর পরিণত চিন্তাভাবনাকে প্রতিফলিত করে।

নির্দিষ্ট বিষয়ে আইনগত সিদ্ধান্ত (ফতোয়া) প্রদানের ব্যাপারে যৌক্তিকতা প্রদর্শন করা, প্রদর্শিত যুক্তির সারবস্তু তুলে ধরা এবং নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করা ইত্যাদি। তাঁরা উসূলে ফিকাহকে আইন বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা হিসেবে দেখেননি এবং সমগ্র আইন ব্যবস্থা পরিস্থিতি বা প্রশ্নের সম্মুখীন হলে সরাসরি পিছনে ফিরে যেতেন অন্য কোন প্রাসঙ্গিক প্রমাণের কাছে, কিন্তু উসূলে ফিকাহর সুনির্দিষ্ট মূলনীতিসমূহের আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন না।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) প্রায় পাঁচ লাখ বিষয়ের উপর ফতোয়া প্রদান করেছেন।[৯] তাঁর ছাত্ররা সেগুলো শিখেছেন এবং তাঁরা নিজেরাও সেগুলো দিয়ে কাজ চালিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু যে আইনগত মূলনীতির ভিত্তিতে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) তাঁর ফতোয়াসমূহ প্রদান করেছেন সেগুলো যেন অবিচ্ছিন্ন দলিলের মতো কোনভাবেই তাঁর নিকট থেকে হস্তান্তরিত হয়নি।[১০] ব্যতিক্রম হিসেবে স্বল্পসংখ্যক প্রতিবেদনে তিনি তাঁর ইজতিহাদের সূত্র বা ভিত্তি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। এরূপ প্রতিবেদনে তিনি বলেন, "আমি আল্লাহর কিতাব অনুসরণ করি, যদি তাতে কোন সমাধান খুঁজে না পাই, তখন রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহর অনুসরণ করি। যদি আমি কুরআন অথবা সুন্নাহ-এ কোন সমাধান খুঁজে না পাই তাহলে আমি পছন্দ মতো কোন সাহাবীর ফতোয়া অনুসরণ করি এবং আমার ইচ্ছা মতো যে কোনটি বাদ দিই। নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে কোন সাহাবীর ফতোয়া থাকলে সে বিষয়ে অন্য কোন গবেষকের মতামত গ্রহণ করি না। কিন্তু যখন আমি দেখতাম যে, শুধুমাত্র ইবরাহীম, শা'বী, ইবন সীরীন, হাসান বসরী, আতা বা সাইদ ইবনুল মুসায়্যাব-এর মতামতের ভিত্তিতে সমাধান বের করা হয়েছে তাহলে আমি তাঁদের মতো ইজতিহাদ করতাম।"[১১]

কিছু সংখ্যক লোক খলিফা আল-মানসূরকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করলে আবু হানিফা (রাঃ) খলিফার কাছে লিখলেনঃ

"পরিস্থিতি আপনি যেরূপ শুনেছেন সেরূপ নয়, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি আল্লাহর কিতাব অনুসারে কাজ করি। অত:পর রাসূলের (সাঃ) সুন্নাহ অনুসারে, অত:পর আবু বকর (রাঃ), উমর (রাঃ), উসমান (রাঃ) এবং আলী (রাঃ)-এর

---

৯. দেখুন মুস্তফা আবদুর রাযযাক, আল-ইমাম আশ-শাফেঈ, পৃঃ ৪৫।
১০. দেখুন আল দেহলভী, আল-ইনসাফ এবং আবু যাহরাহ, আবু হানিফাহ, পৃঃ ২২৩।
১১. দেখুন তা'রীখ বাগদাদ, ৩১শ খণ্ড, পৃঃ ৩৬৪; আল ইনতিকা, পৃঃ ১৪২ এবং মাশায়িখ বালখ আল-হানাফিয়াহ, পৃঃ ১৯০।

রায় অনুসারে তারপর অন্যান্য সাহাবিগণের রায় অনুসারে। তারপর যদি তাঁদের ফতোয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য দেখি তাহলে আমি কিয়াসের সাহায্য নিই। আল্লাহর কোন সৃষ্টি জন্মগতভাবে অন্যদের অপেক্ষা বেশি আল্লাহর প্রিয়জন হতে পারে না।"[১২]

একবার কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত অপেক্ষা কিয়াসকে অগ্রাধিকার প্রদানের জন্য অভিযুক্ত করা হলে তিনি বলেছিলেন:

"আল্লাহর কসম! যারা বলে যে, আমরা নস অপেক্ষা আল কিয়াসকে অগ্রাধিকার প্রদান করি, তারা মিথ্যাবাদী এবং আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনাকারী। নস (সুস্পষ্ট আয়াত) থাকার পরও কিয়াসের কোন প্রয়োজন আছে কি?"।[১৩]

ঙ. এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, ইসলামী খিলাফত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর উমাইয়া যুগের শুরু থেকে উম্মাহর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব এমন লোকের হাতে পড়েছিল যারা ইজতিহাদ করার যোগ্যতা রাখতেন না। অথচ এ সময় ইজতিহাদ করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল আলেমগণের উপর যাদের কোন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল না। উমার ইবন আবদুল আযিয (র:)-এর খেলাফতকাল ছাড়া উল্লেখিত অবস্থার ব্যতিক্রম খুঁজে পাওয়া খুবই দুষ্কর। অথচ এরাই বিভিন্ন আইনগত প্রশ্নে রায় প্রদান করেছেন। উক্ত অবস্থা মুসলমানদের ব্যবহারিক জীবন থেকে ফিকাহ ও উসূলকে পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। ফলে এ বিষয়টি একটি তাত্ত্বিক কল্পনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়।[১৪]

উভয় বিষয়ই অবশ্যম্ভাবীরূপে হয়ে ওঠে মুসলমানদের জীবন কেমন হওয়া উচিত তাঁর বর্ণনা; আসলে কেমন ছিল কিংবা হতে হবে তাঁর বর্ণনা নয়।

চ. লেখক এবং ঐতিহাসিকগণ এ উসূলে ফিকাহ্কে পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শরীয়াহ সংক্রান্ত উসূলসমূহের শ্রেণীভুক্ত করেছেন।[১৫] যদিও

১২। দেখুন আল-সামারকান্দী, মীযান আল-উসূল; ১খ, ৫২; তকীউদ্দীন আল-গাযনী, আত-তাবাকাতুস সুন্নিয়াহ, ১খ ৪৩; এবং মাশায়িখ বালখ, পৃঃ ১৯৩।

১৩. প্রাগুক্ত।

১৪. দেখুন মুহাম্মদ ইউসুফ মূসা, তারিখ আল-ফিকাহ, পৃঃ ১১০।

১৫. দেখুন আল-খাওয়ারিযমী, মাফাতিহ্ আল-উলূম, ৬ষ্ঠ ও ৮ম খণ্ড এবং ইবন খালদূন, আল-মুকাদ্দিমা, ৩খ, ১১২৫-১১২৮, ১১৬১-১১৬৬।

কোন কোন লেখক বলেছেন যে, উসূলের মূলনীতিসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে আরবী ভাষায়, বিভিন্ন যুক্তিবাদী বিজ্ঞান এবং নির্দিষ্ট আরো কতগুলো ইসলামী জ্ঞান শাস্ত্র থেকে।[১৬] এ বিষয়ে একজন বিখ্যাত লেখক ইমাম গাযযালী লিখেছেনঃ "মহত্তম জ্ঞান (ইলম) হচ্ছে সেগুলো যেখানে যুক্তি (আকল) এবং শ্রুতিকে (সামা) একীভূত করা হয়েছে এবং যেখানে ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান ও যুক্তির সমন্বয় সাধনা করা হয়েছে। ফিকাহর জ্ঞান এবং এর উসূল হচ্ছে এরূপ একটি সমন্বিত জ্ঞান। তা নির্ভেজাল প্রত্যাদিষ্ট জ্ঞান এবং সর্বোত্তম যুক্তি– এ উভয়ের অনুসরণ করে। এ জ্ঞান প্রত্যাদিষ্ট আইনের কাছে গ্রহণীয় নয় এমন কোন নিরেট যুক্তির উপর নির্ভর করে না, আবার যুক্তির সমর্থনহীন যে কোন কিছুকে নিছক অন্ধভাবে গ্রহণ করে নেয়ার উপরও এ জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত নয়।[১৭]

ইমাম গাযযালী এবং অন্যান্য লেখকগণ কর্তৃক উসূল সম্পর্কে প্রদত্ত বক্তব্যের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, ফিকাহ-এর তিনটি উৎস রয়েছে :

(ক) ওহী বা প্রত্যাদেশঃ এর মধ্যে রয়েছে ওহী মাতলু (অনুপম কুরআন) এবং ওহী গায়রে মাতলু (সুন্নাহ) এ উভয় প্রকারের প্রত্যাদেশ।

(খ) আকল বা যুক্তি : কুরআনের আয়াতে নির্দেশ কিভাবে প্রয়োগ করা যাবে এবং সংশ্লিষ্ট অংশটি কিভাবে সমগ্র বিষয়ের সাথে সমন্বিত হবে তা অনুসন্ধান করা, কোন আইন জারি করার কারণ বাহ্যিকভাবে চিহ্নিত করা গেলেও এর অন্ত র্নিহিত কারণ খুঁজে দেখা, যে বিষয়ে কুরআনে আইনদাতা (আল্লাহ) কোন স্পষ্ট সিদ্ধান্ত প্রদান করেননি সে বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়সমূহ যেগুলোর সংজ্ঞা প্রদান করা ও এর ব্যাখ্যা প্রদান করা যায়। এসব ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও যুক্তির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

(গ) অভিজ্ঞতা, প্রথা এবং জনস্বার্থঃ সকল প্রকার উসূল যেগুলো সম্পর্কে গবেষকগণের মধ্যে মতৈক্য আছে এবং যেগুলো সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে এ উভয় প্রকার উসূলকে নিম্নোক্ত শিরোনামে বিন্যস্ত করা যায়ঃ

---

১৬. দেখুন মিফতাহুস-সা'আদাহ।
১৭. দেখুন আল-গাযযালী, আল-মুস্তাসফা, খণ্ড ১, পৃঃ ৩ এবং আল-মানখূল, শিফা আল-গালিল ফি বায়ান আল শিবহ ওয়া আল-মাখিল, মাসালিহ আল-তালিল এবং তাহজীব আল-উসূল, উল্লিখিত সবগুলো উসূল সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কিতাব।

কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস, যে সকল বিষয় মূলত: উপকারী সেগুলোর অনুমোদন এবং যে সকল বিষয় মূলত: ক্ষতিকারক সেগুলো নিষিদ্ধকরণ বিষয়ক ধারণা (আল-ইসতিসহাব এবং আল-ইসতিহসান)। এ ছাড়াও রয়েছে সাহাবীগণের ফতোয়া যা তাঁদের নিজেদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল এবং তাঁদের মধ্যে কেউ সে বিষয়ে আপত্তি করেননি। সব সময় অপেক্ষাকৃত কম কষ্টকর বিকল্প গ্রহণ করার নীতি, তুলনা করার জন্য স্বল্পসংখ্যক প্রাপ্তব্য নমুনার ভিত্তিতে গবেষণা করা; সর্বসাধারণের স্বার্থ এবং প্রথাসমূহ যেগুলো সম্পর্কে ইসলামে কোন আদেশ-নিষেধ নেই, যে বিষয়ে আইন সম্পর্কিত কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, যে বিষয়ে কোন আইন নেই-এরূপ উপসংহারে আসা; ইসলাম-পূর্ব অন্যান্য জাতিসমূহের আইন এবং সেগুলোর যৌক্তিকতা প্রদর্শনের পথরুদ্ধ করা ইত্যাদি।

ছ. আমাদের ইতিহাসে এমন কিছু সুনির্দিষ্ট কার্যকারণ বিদ্যমান ছিল, যার কিছু কিছু ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যা আমাদেরকে বিভিন্নভাবে নিরুৎসাহিত করেছে এবং আমাদের উপর বহু প্রতিবন্ধকতা আরোপ করেছে। ফলে আমাদের ইসলামী মানসিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছিল ছোটখাট বিষয়ের প্রতি এবং আমরা বিষয়াবলীকে সামগ্রিকভাবে চিন্তা না করে ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে বিভ্রান্ত হচ্ছিলাম। ইসলামী চিন্তার এই অবস্থাকে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এ অবস্থা আমাদের ফিকাহ চর্চা এবং যে সকল সমাধান আমরা খুঁজে বের করেছি তার উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে।

জ. এটা সবার জানা যে, প্রতিটি বিজ্ঞানে এবং মানুষে জীবন যাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমন কিছু বিষয় আছে যা স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সকল সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণতা দানের উদ্দেশ্যেও এই বিকাশের প্রয়োজন হয়ে থাকে। তারপরও কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলো স্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয়। ইসলামী যুক্তিবিদ্যা অনুসারে এ উভয় দিকের অবশ্যই সমন্বয় ঘটাতে হবে। তদ্রুপ উসূলে ফিকাহর কিছু স্থায়ী নিয়ম আছে যেগুলো পরিবর্তন করা যায় না। আবার কিছু কিছু বিষয়কে অনবরত বিকাশ ও নবায়নের উপর নির্ভর করতে হয়। ইজতিহাদ সম্পর্কিত আলোচনা থেকে বিষয়টির আরো পরিষ্কার হয়েছে।

অতএব আমরা সকল মুসলিম চিন্তাবিদগণকে শূন্যতা শুরু না করার জন্য অনুরোধ জানাই। তাঁরা যেন তাঁদের পূর্ববর্তী গবেষকগণের যুক্তি ও ইজতিহাদ

থেকে সাহায্য গ্রহণ করেন। আমরা এ কথা স্বীকার করি যে, যে সকল বিষয়ে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত চিন্তাপ্রসূত যুক্তির ভিত্তিতে ফতোয়া প্রদান করা হয়েছে, সে সকল বিষয়ে কোন মুজতাহিদকে অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক নয়। আমরা অবশ্য বলতে পারি যে, তাঁর ফতোয়া হচ্ছে একটি ব্যক্তিগত অভিমত বিশেষ এবং তাঁর মতের সাথে শরীক হওয়া যায়।[১৮]

ঝ. প্রাথমিক যুগের মনীষীদের (সালাফ) অনুসৃত পদ্ধতি পর্যালোচনা করলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মাণ হয় যে, শুধুমাত্র আইন প্রণয়ন এবং ফতোয়া প্রদান করাই তাঁদের লক্ষ্য ছিল না, বরং সর্বদা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর আইন প্রয়োগ করে তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠা করা। এর অর্থ স্পষ্টত এই দাঁড়ায় যে, আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। উপরে বর্ণিত বিষয়াবলী অনুধাবন করে আমরা যদি উসূলে ফিকাহকে ইসলামী জ্ঞানসমূহের সাথে যথাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই এবং এ বিজ্ঞানকে শরীয়াহর দলীল বের করার একটি গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে রূপান্তর করে তা থেকে সমকালীন সমস্যার সমাধান ও সিদ্ধান্ত পেতে চাই (শরীয়াহর সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে) তবে আমাদেরকে অবশ্যই নিম্নবর্ণিত কাজগুলো করতে হবে।

(১) উসূলে ফিকাহতে আলোচিত বিষয়সূচি পর্যালোচনা করা এবং যে সকল বিষয়ের সাথে আধুনিক উসূলবিদগণের সম্পৃক্ততা নেই সেগুলো বাদ দেয়া। বাদ দেয়া বিষয়গুলোর মধ্যে হুক্মুল-আশয়া কাবলাশ শার (শরীয়াহ-পূর্ববর্তী বিধিবিধান), শুকরুল মুনইম (সর্বশক্তিমান নিয়ামতদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা), মাবাহিছ হাকিমিয়্যাতিশ শার' (শরীয়াহর সার্বভৌমত্ব সম্পর্কিত অধ্যয়ন) এবং বিভিন্ন সংজ্ঞার বিষয়ে অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করা ইত্যাদি বিষয় অবশ্যই তালিকাভুক্ত করতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই কুরআনের অনুমোদিত পাঠ (কিরাআত শাজ্জাহ) এবং সমগ্র কুরআনের আরবী ভাষাগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিতর্কসমূহ পরিষ্কার করতে হবে। অনুরূপভাবে একজনমাত্র রাবী (বর্ণনাকারী) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস সম্পর্কিত দীর্ঘদিনের বিদ্যমান মতানৈক্যের এভাবে সমাপ্তি টানতে হবে যে, যদি ঐরূপ বর্ণনা সহীহ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ করতে সক্ষম হয় তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং তা থেকে আইন প্রণয়ন করা যাবে।

---

১৮. খলীফা উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর প্রতি আরোপিত একটি বহুল প্রচলিত অভিমত।

এছাড়া প্রাথমিক যুগের ইমামগণ সমকালীন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে যে সকল শর্ত নির্ণয় করেছিলেন, সেগুলো পুনঃপরীক্ষা করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে এ শর্তগুলোর কথা বলা যেতে পারে যে, কোন হাদীস তাঁদের নিরূপিত সাধারণ নীতিমালার পরিপন্থী হতে পারবে না, ফকীহ ভিন্ন অন্য কারো বর্ণিত হতে পারবে না এবং কিয়াসের সাথে সাংঘর্ষিক বা মদিনাবাসীদের ঐতিহ্য বিরোধী হতে পারবে না, অথবা কুরআনের বাহ্যিক (জাহির) অর্থের পরিপন্থী হতে পারবে না ইত্যাদি। আরেকটি শর্ত, যেমন সাধারণভাবে প্রয়োজ্য কোন বিষয় অথবা কষ্টকর বা পীড়াদায়ক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন হাদীস ব্যাপকভাবে পরিচিত হতে হবে। এসব শর্ত বাতিল করতে হবে। অনুরূপভাবে যে সকল শর্ত এখনো বিতর্কিত, যে সকল শর্ত মুসলমানগণের মধ্যে মতানৈক্যের উৎস হয়ে আছে এবং এখনো চিন্তাবিদগণের সময়ক্ষেপণ করছে সেসব শর্ত পরিহার করতে হবে।

(২) ফিকাহর সাথে সম্পর্কিত ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা করতে হবে। গবেষণার মাধ্যমে রাসূল (সাঃ)-এর সময় আরবদের প্রকাশভঙ্গি পরীক্ষা করে দেখতে হবে, প্রকাশভঙ্গির বিভিন্ন পর্যায়ক্রমিক বিকাশ এবং পরবর্তীকালে সেগুলোর অবলুপ্তি সম্পর্কিত ধারাবাহিকতা তুলে ধরতে হবে। শব্দের বিভিন্ন প্রকার তাৎপর্য এবং চলতি ব্যবহারসমূহ চিহ্নিত করতে হবে।

(৩) কিয়াস, ইসতিহসান, মাসলাহাহ ও ইজতিহাদের অন্যান্য পদ্ধতি ও মূলনীতিসমূহের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। মুজতাহিদগণ কোন্ অবস্থার প্রেক্ষিতে ফতোয়া প্রদান করেছিলেন, সে সকল বিষয়কে বিবেচনায় এনে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সেগুলোকে পর্যালোচনা করতে হবে। আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে, যারা ফিকাহ এবং উসূল সম্পর্কে গবেষণা করছেন, তাঁদের মধ্যে যেন ফকীহ সুলভ অনুভূতি গড়ে ওঠে।

(৪) এ কথা অনুধাবন করতে হবে যে, বর্তমান সময়ে মুজতাহিদ মুতলাক (নিরংকুশ) হওয়া অথবা কোন ব্যক্তির নিজ যোগ্যতাবলে আইন বিষয়ে (অর্থাৎ আইনের উৎস ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে) সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য রায় প্রদান করা প্রায় অসম্ভব। এ অবস্থা যতদিন চলতে থাকবে ততদিন একটি একাডেমিক কাউন্সিলকে মুজতাহিদ মুতলাকের সর্বোত্তম বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

উম্মাহর আইন বিষয়ক চাহিদা পূরণে এ কাউন্সিল যাতে সক্ষম হয় সে জন্য কাউন্সিল মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ দ্বারা গঠিত হবে। যাতে তারা উদ্ভূত যে কোন সমস্যা অনুধাবন করতে পারেন। এছাড়া ইসলামী শরীয়ার সাধারণ নিয়ম ও মূলনীতি সম্পর্কে তাঁদের পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে। এরূপ কাউন্সিলের উসূলে শরীয়াহ এবং অন্যান্য বিষয়ের উসূল সম্পর্কে অভিজ্ঞ উচ্চ পর্যায়ের ফকীহগণকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আমাদের একজন বিখ্যাত ফকীহ তাঁর একটি অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন। এক ব্যক্তি রমযান মাসে রোযাভঙ্গ করার ব্যাপারে অনুমতি চাইলে তিনি লোকটিকে বলেছিলেন একজন বিশ্বস্ত মুসলমান ডাক্তারের পরামর্শ নিতে। যদি ডাক্তার তাঁর স্বাস্থ্যের জন্য রোযা থাকা ক্ষতিকর বলে বিবেচনা করেন, তবেই কেবল তিনি রোযা থেকে বিরত থাকতে পারেন।

(৫) অন্যান্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ উসূলে শরীয়ার যে জ্ঞান অর্জন করার প্রয়োজন অনুভব করেন, তাঁদের জন্য বিষয়টিকে সহজতর করে দিতে হবে।

(৬) সাহাবী এবং তাবেয়ীগণের ফিকাহ সম্পর্কে, বিশেষ করে তাঁরা যে নীতিমালার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন, সেগুলো সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত হতে হবে। বিশেষত খুলাফায়ে রাশেদা ও তাঁদের সমসাময়িক সাহাবীগণের ফিকাহ সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। অত:পর বর্তমান মুসলিম সমাজের সমকালীন চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এ জ্ঞানকে আইন প্রণেতা ও ফকীহগণের হাতে তুলে দিতে হবে।

(৭) শরীয়ার লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের জানার আগ্রহ থাকা প্রয়োজন এবং এ বিষয়ে জ্ঞানের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নিয়ম ও নির্দেশিকা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

আল্লাহ আমাদেরকে তাওফিক দিন।

বিআইআইটি'র বাংলা বইসমূহ

বই	লেখক	মূল্য
◆ আত-তাওহীদ : চিন্তাক্ষেত্রে ও জীবনে এর অর্থ ও তাৎপর্য	*ইসমাইল রাজী আল ফারুকী*	১৭৫/-
◆ ইসলামের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতা নিয়ন্ত্রণ	*ড. আব্দুলহামীদ আহমাদ আবুসুলায়মান*	৩০০/-
◆ ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	*ড. আব্দুলহামীদ আহমাদ আবুসুলায়মান*	২৫০/-
◆ মুসলিম মানসে সংকট	*ড. আব্দুলহামিদ আহমেদ আবুসুলায়মান*	১৫০/-
◆ জ্ঞানের ইসলামায়ন	*ড. আব্দুলহামিদ আহমেদ আবুসুলায়মান*	৩০/-
◆ ইসলামের দন্ডবিধি	*ড. আব্দুলহামিদ আহমেদ আবুসুলায়মান*	২০/-
◆ ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ	*ড. এম উমর চাপরা*	২০০/-
◆ ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন	*ড. এম উপর চাপরা*	২০০/-
◆ রাসূলের (স:) যুগে মদীনার সমাজ (১ম খণ্ড)	*ড. আকরাম জিয়া আল আমরী*	৫০/-
◆ রাসূলের (স:) যুগে মদীনার সমাজ (২য় খণ্ড)	*ড. আকরাম জিয়া আল আমরী*	১৭০/-
◆ রাসূলের (স:) যুগে নারী স্বাধীনতা (২য় খণ্ড)	*আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ*	৩০০/-
◆ রাসূলের (স:) যুগে নারী স্বাধীনতা (৪র্থ খণ্ড)	*আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ*	৩০০/-
◆ কোরআন ও সুন্নাহ: স্থান-কাল প্রেক্ষিত	*তাহা জাবির আল আলওয়ানী ও ইমাদ আল দীন খলিল*	৫০/-
◆ ইসলামে উসূলে ফিকাহ	*ড. তাহা জাবির আল আলওয়ানী*	৭০/-
◆ ইসলামী শিক্ষা সিরিজ (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড একত্রে)	*ড. জামাল আল বাদাবী*	৩০০/-
◆ মুসলিম নারী-পুরুষের পোশাক	*ড. জামাল আল বাদাবি*	২০০/-
◆ রাষ্ট্রবিজ্ঞান : ইসলামী প্রেক্ষিত	*অধ্যাপক আবদুর রশিদ মতিন*	১৭৫/-
◆ প্রশাসনিক উন্নয়ন : ইসলামী প্রেক্ষিত	*ড. মুহাম্মদ আল ব্যুরে*	৩০০/-
◆ শিক্ষক প্রশিক্ষণ : ইসলামী প্রেক্ষিত	*ড. এম. জাফর ইকবাল*	১৫০/-
◆ উন্নয়ন ও ইসলাম	*প্রফেসর খুরশিদ আহমেদ*	৩৫/-
◆ তাফসীর সাহিত্য ও সাহিত্যিক	*প্রফেসর ড. রশীদ আহমদ কালন্ধরী*	১০০/-
◆ ইসলামের দৃষ্টিতে নারী	*বি.আইশা লেমু ও ফাতিমা হীরেন*	৫০/-
◆ ইসলামী অর্থনীতিতে পণ্য বিনিময় ও স্টক এক্সচেঞ্জ	*এম আকরাম খান, এম রকিবুজ জামান*	৭০/-
◆ লোক-প্রশাসন : সংগঠন, প্রক্রিয়া ও অনুচিন্তা	*প্রফেসর আবদুন নূর*	২০০/-
◆ ইসলামী দাওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট	*প্রফেসর ড. আবদুর রহমান আনওয়ারী*	২০০/-
◆ ইসলামী জীবনবীমা : বর্তমান প্রেক্ষিত	*কাজী মো: মোরতুজা আলী*	১৭৫/-
◆ ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা-সামাজিক প্রেক্ষাপট	*এম রুহুল আমিন অনুদিত*	১৩০/-
◆ আমাদের সংস্কৃতি	*প্রফেসর মো: জয়নুল আবেদীন মজুমদার সম্পাদিত*	৬০/-
◆ গণতন্ত্র ও ইসলাম	*এম. আবদুল আযিয সম্পাদিত*	১২০/-
◆ সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম	*এম. আবদুল আযিয সম্পাদিত*	১০০/-

English Publications of BIIT

Journal

Bangladesh Journal of Islamic Thought (BJIT)

Edited by *Prof. Dr. UAB Razia Akter Banu* 100/-

Book

- Medical Education *Prof. Dr. Omer Hasan Kasule* 200/-
- Medical Ethics *Prof. Dr. Omer Hasan Kasule* 50/-
- Islam in Bengali Verse *Poet Farruk Ahmed* 100/-
- A Young Muslim's Guide to Religions in the World
  Prof. Dr. Syed Sajjad Husain 250/-
- Civilization and Society *Dr. Syed Sajjad Husain* 300/-
- Guidelines to Islamic Economics, Nature, Concept and Principles
  Prof. M. Raihan Sharif 350/-
- A Dynamic Analysis of Trade and Development in Islam Countries
  Prof. Dr. Masudul Alam Chowdhury 350/-
- Origin and Development of Experimental Science
  Prof. Dr. Muin-Ud-din Ahmad Khan 120/-
- On Openness, Integration and Economic Growth
  Prof. Dr. M. Kabir Hasan 200/-
- Shah Wali Allah's Concept of Ijtihad and Taqlid
  Prof. Dr. Md. Athar Ali 250/-
- Social Laws of Islam *Shah Abdul Hannan* 40/-
- Accounting, Philosophy, Ethics and Principles
  M. Zohurul Islam FCA 200/-
- Al-Zakah : A Hand Book of Zakah Administration
  M. Zohurul Islam FCA 250/-
- Islamization of Academic Discipline
  Edited by M. Zohurul Islam FCA. 150/-
- An Analysis of History of the Socio-Economic Thought
  M. Zohurul Islam FCA. 100/-
- Interfaith Relation : National & Regional Perspective
  Edited by M. Zohurul Islam FCA. & M. Abdul Aziz 100/-
- Leadership : Western and Islamic
  Dr. M. Anisuzzaman & Prof. Zainul Abedin Majumder 70/-
- Man and Universe *Major Md. Zakaria Kamal* 200/-
- Islamic Theory of Jihad and International System
  Dr. *Md. Moniruzzaman* 200/-

BIIT AT A GLANCE

Bangdesh Institute of Islamic Thought (BIIT) is a think- tank which engaged in research and indepth study for synthesizing education, culture & ethics. It was established in the year 1989 as a non-government research organisation with the following programs -

- **Research** : In order to identify the Islamic approach in different disciplines of higher education, BIIT conducts the research programs under the supervision of senior faculties of Public Universities.
- **Translation** : In order to publicise the ideas and thoughts of major scholars of the world, BIIT took an initiatives to translate the major books of major scholars written in Arabic and English.
- **Publication** : BIIT publishes the original writings, research works, translation work and seminar proceedings which are used as reference for teachers, students, researchers and thinkers.
- **Library Service** : BIIT has a good number of rare books and journals including the publications of IIIT, USA. These books and journals are preferentially issued to readers of different professionals, university teachers, students and researchers.
- **Supplying the Materials** : One of the major Program of BIIT is collection, preparation and supplying of study materials on National, International and Ummatic Issues.
- **Series of Seminar & lecture** : From the very beginning BIIT is working for organizing the seminers, symposiums, workshops, study circles, discussion meetings etc related to thoughts on education, culture and religion.
- **Exchange Program** : To exchange the informations, Ideas and views, BIIT organizes the partnership program with related organizations and individuals at home and abroad.
- **Distribution of Publications** : In order to dissmination of knowledge, BIIT distributed the publications of IIIT and BIIT to the concerned organizations and individuals.
- **Training & Workshop** : BIIT is conducting the different types of training on research methodology, english & arabic language course etc so that the concerned can perform their activities more efficiently & skilfully.
- **Dialogue & Roundtable discussion** : Dialogues on national & Internationl issues particularly Inter-faith issue, socio-economic issue are arranged by BIIT

লেখক পরিচিতি

ড. তাহা জাবির আল আলওয়ানী ১৯৩৫ সালে ইরাকে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি নিজ দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করার পর কায়রোর আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৫৯ সালে শরীয়া ও আইন শাস্ত্রেঅনার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৮ সালে থেকে ফিকাহ ও উসূলে-ই-ফিকাহ বিষয়ে মাষ্টার্স ডিগ্রি ও ১৯৭৩ সালে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনি ১৯৭৫ সাল হতে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত দশ বছর রিয়াদস্থ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ে *ফিকাহ-ও উসূলে-ই-ফিকাহ* এর প্রফেসর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৮১ সালে তিনি ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট -এর প্রতিষ্ঠাপর্বে যোগ দেন। পরে তিনি এর সভাপতি ও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি রাবিতা আলমে আল ইসলামীরও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯৮৭ সাল হতে তিনি ওআইসির ইসলামিক ফিকাহ একাডেমীর সদস্য এবং ১৯৮৮ সাল হতে উত্তর আমেরিকার ফিকাহ পরিষদের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

একজন শক্তিমান ও প্রাজ্ঞ লেখক হিসেবে তিনি ইসলামী বিধানশাস্ত্র / আইনশাস্ত্র বিষয়ে যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেছেন তার অন্যতম ক'টি হলো -

- আল ইজতিহাদ ওয়াআল তাকলিদ ফি আল ইসলাম (Legal Reasoning and Imitation in Islam)
- আল মাহসুল ফি ইলম উসুল আল ফিকাহ (The Sum and Substence of Usul al Fiqh)
- আদব আল ইখতিলাফ ফি আল ইসলাম (The Ethics of Disagreement in Islam)
- হুকুক আল মুত্তাহাম ফি আল ইসলাম (Rights of the Accused in Islam)
- উসুল আল ফিকাহ আল ইসলামী (Usul Al Fiqh al Islami)

ISBN : 984-8203-34-2

উসূল আল ফিকাহ এমন এক একটি বিজ্ঞান যার মধ্যে যুক্তি ও অহীলব্ধ জ্ঞান/প্রত্যাদিষ্ট জ্ঞান একত্রিত হয়েছে। এক্ষেত্রে গৃহীত আইন দ্বারা বিবেচিত মতামতকে পাশাপাশি স্থান দেয়া হয়েছে। প্রত্যাদিষ্ট আইনে অগ্রহণযোগ্য বা শুধু যুক্তি নির্ভরতার উপর উসূল আস্থা রাখেনা, আবার যুক্তি দ্বারা সমর্থিত নয় শুধু অন্ধভাবে গৃহীত কোন কিছুর উপরও উসূল ভিত্তি স্থাপন করেনা। তাই উসূল আল ফিকাহ বিজ্ঞানকে ইসলামের দর্শন বলা হয়।

ইসলামের প্রথম যুগে ইসলামী চিন্তাবিদগণ যে বিজ্ঞানকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা পদ্ধতি বলে বিবেচনা করতেন - সেই উসূলে ফিকাহকে বর্তমানে যে সমস্ত সমাজ বিজ্ঞান ও মানবিক বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞগণ-যারা বিষয়টি বিস্তারিত চর্চা করার সুযোগ পাননি বা এ ব্যাপারে যারা অনবহিত, তাদের নিকট সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে বিষয়টি তুলে ধরার জন্য এ বইটি একটি অন্যতম পদক্ষেপ।

শিক্ষিত সমাজ ও ইসলামী চিন্তাবিদদের একাডেমিক গবেষনার জন্যে সিরিজ বই হিসেবে এটি ব্যবহারযোগ্য।